নজরুলের প্রেম

রমেন দাস

মৌসুমী সাহিত্য মন্দির
১৫/বি, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
নববর্ষ, ১৩৬১

প্রকাশক :
প্রশান্ত তালুকদার

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোষ
চন্দ্রশেখর প্রেস
১৮১/৬ এ. পি. সি. রোড
কলিকাতা-৭০০০০৪

প্রীতিময়

অরুণ-আলোর করকমলে—

লেখকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই ॥

জয়সূর্য (কিশোর উপন্যাস)

ঘরে বাইরে নজরুল

ঘরে বাইরে শরৎচন্দ্র

অগ্নিহোত্রী শ্রীঅরবিন্দ

অনেক মানুষ একটি মন

রবীন্দ্র প্রণাম

ছেলেদের নজরুল

রবির আলো

স্বর্গ বিজয়

আজাদ হিন্দের শেষ লড়াই

॥ আসন্ন প্রকাশ ॥

আফ্রিকার কান্না

অন্য নগর, অন্য কলকাতা

মানুষের জীবনই মানুষকে সবচেয়ে বেশী প্রতারণা করে। রাধা ভালবেসেছিল কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণের বাঁশীকে, তোমরাও ভালবাস আমাকে নয়—আমার সুরকে, আমার কাব্যকে। ·· সূর্যের কিরণ আলো দেয়। কিন্তু সূর্য নিজে দিবানিশি হচ্ছে দগ্ধ। আলো সওয়া যায়, শিখা সওয়া যায় না। আমি জ্বলছি শিখার মত।···

ফুল মধু দেয়, গন্ধ দেয়, কথা কয়না—বহু ভ্রমরার সাধ্য সাধনাতেও না। বাঁশী কাঁদে, যখন গুণীর মুখে তার মুখে চুমোচুমি হয়, বাকি সময়টুকু সে এক কোণে নির্বাক নিশ্চুপ হয়ে পড়ে থাকে। একই ঝাড়ের বাঁশ, ভাগ্যদোষ বা গুণে কেউ হয়ে ওঠে লাঠি, কেউ বাঁশী।

—নজরুল ইসলাম্

ব্যক্তিপ্রেম

॥ সবিনয় নিবেদন ॥

কবি নজরুল বাঙালীর মানসপটে বিদ্রোহী কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত। শোষণ-শাসন কিম্বা পরাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অপ্রতিহত সোচ্চার। তাঁর বেপরোয়া আর বল্গাহীন জীবন কখনও অন্যায়-অসুন্দরের সঙ্গে আপোষ করেনি। তাই বোধকরি, বাংলা তথা ভারতের আরেক মহান বিপ্লবী ও আপোষহীন নেতা সুভাষচন্দ্রও বিদ্রোহী কবির কথা, গান আর ছন্দে, বিপ্লব-বিদ্রোহের সুর খুঁজে পেয়েছিলেন। গুণমুগ্ধ সুভাষচন্দ্র তাই নজরুল-সম্বর্ধনা সভায় একদিন বলেছিলেন : কবি ঘাড়ে বন্দুক নিয়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সব লিখেছেন। আমরা যখন যুদ্ধে যাব, তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে।···

পরবর্তী জীবনে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়করূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক অভিযানে তিনি নজরুলের গণসঙ্গীতকে রণসঙ্গীতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গীত-সুরের তালে তাল মিলিয়ে আজাদী সেনারা পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিযুদ্ধে হাসি মুখে প্রাণ দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবির স্বদেশপ্রেমের অজস্র ঘটনার মধ্যে এ ধরনের অনেক ইতিহাস এখনও অজ্ঞাতপ্রায়।

শুধু স্বদেশপ্রেম কেন, ব্যক্তিপ্রেমের বৈচিত্র্যে আর নিষ্ঠায়ও কবি ছিলেন অনন্য। অগ্নিতাপস এই বিদ্রোহী কবির জীবনেও ফুটেছিল ভালবাসার অনেক ফুল। প্রেম-প্রীতি রাগ-অনুরাগ আর সুখ-দুঃখের বিচিত্র ধারায় তাঁর জীবন বিধৃত। স্বদেশ প্রেমের দৃপ্ত শপথে আপোষহীন কবি যেমন উদ্ধত ছিলেন, তেমনি আবার প্রেয়সীর পদে প্রেম নিবেদনেও বিনম্র বিনত ছিলেন। বিদ্রোহী কবির ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রেম আর ব্যক্তি প্রেমের বিচিত্র রসের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে লেখা 'নজরুলের প্রেম'।

সুদীর্ঘকাল কবি, কবি-পত্নী, এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থেকে নীরবে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি। এ ছাড়া পুরানো দিনের পত্রপত্রিকা, বিশেষ করে কবিবন্ধু কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং ডঃ সুশীল গুপ্তের বিভিন্ন রচনাও আমার এই গ্রন্থ বিন্যাসে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। প্রকাশক শচীন বিশ্বাস এবং প্রশান্ত তালুকদার সহ এঁদের সকলের কাছেই আ'ম কৃতজ্ঞ।

রমেন দাস

আষাঢ়ের গভীর রাত। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘন-ঘোর অন্ধকার। চারদিক নির্জন নিস্তব্ধ।

একটু আগেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জল আর কাদায় পথ চলা দায়। অচেনা অজানা পথ। সূচীভেদ্য অন্ধকারে তবুও দুই সতর্ক যাত্রী দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে চলেছেন। মুখে ভাষা নেই। বুকভরা আতঙ্ক আর আশঙ্কা। এই বুঝি কেউ এসে পড়ে, অথবা তাদের গোপন যাত্রার খবর ফাঁস হয়ে যায়।

ঝোপ-ঝাড় আর গাছের ডালে অজানা পাখিরা আচম্‌কা ডানা ঝাপটা দেয়। শঙ্কিত দুই যাত্রী চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়ান। গাছের আড়ালে নিজেদের গোপন রেখে আকার-ইঙ্গিতে আর ইশারায় তাঁরা ভাব বিনিময় করেন। অজানা আশঙ্কায় তাঁদের বুক দুর্‌দুর্‌ করে ওঠে। তারপর মধ্যরাত্রের পাখিদের কর্কশ-ধ্বনি শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হন। বুঝতে পারেন, কেউ তাঁদের অনুসরণ করছে না, ওটা পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ।

আবার দুই বন্ধুর যাত্রা শুরু হয়। অতি সন্তর্পণে দ্রুতপায়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। উদ্দেশ্য : ভোরের আলো ফুটবার আগেই কুমিল্লা সহরের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুনো।

সুপরিকল্পিতভাবে এবং দ্রুতপায়ে দুই বন্ধু এগিয়ে চললেন। এক বন্ধু তখনকার বাংলার ঘরে ঘরে অতি পরিচিত এবং অতি আলোচিত এক তরুণ। নাম, কাজী নজরুল ইসলাম। আর এক সহযাত্রী তাঁর বন্ধু কুমিল্লার বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেকার ঘটনা। কুমিল্লায় গণ্ডগ্রাম দৌলত-পুরের সান্ধ্য মজলিশের কথা কবি ভুলতে পারেন না। সবটাই স্বপ্ন, অথবা দুঃস্বপ্ন বলে তাঁর মনে হয়।

বিয়ের আসর। হাসি-আনন্দ-গান-আবৃত্তি আরও কত কী। লোকে লোকে ভরা সেই আসর অথবা বাসর। বাসর ঘরে বসা ভাবীবধূর লাজুক মুখের মিষ্টি হাসি হঠাৎ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তাঁর মামা আলি আকবর খানও কেমন যেন গম্ভীর। তাঁর চোখে মুখেও ফুটে উঠল কপট-ক্রূর হাসির কঠিন রেখা···চক্রান্ত···ফাঁদ···না, এর বেশি আর কিছুই স্মরণ করতে পারেন না কবি নজরুল। ওসব কথা ভাবতে গেলেই তাঁর মাথায় খুন চেপে যায়।

কবি তাই তাঁর চলার গতি আরও দ্রুত করেন। দৌলতপুর থেকে কুমিল্লার কান্দির পাড়া। পায়ে হাঁটা ঐ পথের দূরত্বও প্রায় মাইল দশেক।

ভোরের আকাশে সবে আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। অন্ধকারের পাখিরা আলোর আহ্বানে কলমুখর। কবির মনেও এবার নতুন চেতনা, নতুন প্রেরণা। অন্ধকার রাত্রি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের সব আতঙ্ক, আশঙ্কা আর দুর্ভাবনার কালিমা যেন এক লহমায় কে মুছে দিয়ে গেছে।

তরুণ কবি হাসলেন। তাঁর মনের সব আনন্দ উপচে পড়তে চায়। মুক্তির আনন্দে কবি নজরুল তখন চঞ্চল অধীর। এক হাতে বন্ধুবর সহযাত্রী এবং সহকর্মীর হাত ধরলেন, আরেক হাত আকাশের দিকে তুলে তরুণ কবি আবৃত্তি শুরু করলেন :

বোঝ নিজ ভুল
জোয়ারের উচ্ছ্বাস ওঠো
ভেঙে চলো কূল।

দিকে দিকে প্লাবনের বাজায়ে বিষাণ
বলো : প্রেম করে না দুর্বল, ওরে করে মহীয়ান !
বারুনী—সাকীরে কহ :
আনো সখি সুরার পেয়ালা—
আনন্দে নাচিয়া ওঠো
দুঃখের নেশায় বীর ভোল সব জ্বালা।

সব জ্বালা ভুলতে, দুঃখের নেশায় অধীর হতে কবির কেন এই আকুলতা ? কারণ, তার আগের রাত্রে দৌলতপুরের বিবাহ-বাসরে তিনি এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস রচনা করে এসেছিলেন। সেই ইতিহাসের নায়ক তরুণ কবি নজরুল স্বয়ং। আর নায়িকা সৈয়দা খাতুন। ওরফে নার্গিস। ফুলকে ভালবাসতে গিয়ে ভুলের ফসলে কবির জীবন-ডালি পূর্ণ হতে চলেছিল। ঐতিহাসিক সেই তারিখ ১৩২৮ সালের ৩রা আষাঢ়, শুক্রবার। ইংরাজির ১৯২১ সালের জুলাই মাস।

ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য তারও কয়েকমাস আগে। কাজী নজরুল তখন ৩২নং কলেজ স্ট্রীটের একটি ছোট ঘরে থাকেন। ঐ বাড়িতেই মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিস। একটি ভাঙা তক্তপোশ আর হারমনিয়ম তাঁর সম্পদ। অবসর সময়ে তিনি কবিতা, গান লেখেন; আর কালি-কলম নিয়ে সৃষ্টির সাগরে ডুবে থাকেন। বিকালে সাহিত্যিক বন্ধুরা সাহিত্যিক মজলিশে আসেন। কাজী তখন তাদের সকলের কেন্দ্রবিন্দু। সদ্য যুদ্ধ ফেরত কবির প্রাণ-মাতানো গান, আবৃত্তি, মন-মজানো খোসগল্পে সতীর্থ বন্ধুরা ক্রমে তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। নজরুল যেন একাই এক শ'। ঐ আসরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মোজাফ্ফর আহমেদ সহ তৎকালীন বাংলার বহু সাহিত্যিক সাহিত্যিরসকের নিয়মিত যাতায়াত।

সাহিত্যের ঐ আসরে একদিন এক নতুন মুখ দেখা গেল। তাঁর নাম আলি আকবর খান। নিবাস কুমিল্লার (বর্তমান বাংলা দেশ).

দৌলতপুর গ্রাম। নিয়মিত আসেন। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন। নজরুলের সঙ্গেও তাঁর ভাব এবং ঘনিষ্ঠতা হল। বলাবাহুল্য, ঐ আলি আকবর খানই কবির জীবনে প্রথম প্রেমের ফুল তুলে ধরেন। তার পেছনে অবশ্য আকবর খানের ব্যক্তি স্বার্থ ছিল অনেক বেশি। খান সাহেবের পরিচয় প্রসঙ্গে নজরুল-বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমেদ লিখেছেন : আমরা দেখতাম যে সম্রাট বাবরের জীবন নিয়ে তিনি একখানা নাটক লিখেছেন। অর্থাৎ, তাঁর নিজের স্বভাবেই শুধু নাটকীয়তা ছিল না, তিনি একখানা নাটক রচনাও করেছিলেন। তাঁর লেখা তিনি আমায় পড়েও শোনাতেন। ধৈর্য ধারন করে আমায় তা শুনতে হতো। লেখায় আন্দিজানের কথা আসলেই তিনি তাঁর গলায় স্বরে খানিকটা দেশপ্রেমের ভাব ফুটিয়ে তুলতেন। আন্দিজান উজবেকিস্তানের একটি জায়গা। খানসাহেব তাকে বাবরের জন্মস্থান রূপে চিত্রিত করেছিলেন। তারপরে দেখতাম, তিনি বিভিন্ন জিলার ছোট ছোট ভৌগোলিক বিবরণ লিখে ছাপাচ্ছেন।...তাঁর কথাবার্তা হতে বুঝতাম যে, প্রাথমিক স্কুলের পাঠ্যপুস্তক লিখে বা প্রকাশ করে তিনি একদিন বিত্তশালী হবেন। এই পুস্তকগুলির জন্যে তিনি কবিতা নিজেই লিখতেন। সে যে কী অপূর্ব চীজ হতো, তা প্রকাশ করা কঠিন। আমি ঠাট্টা করে তাঁকে বলতাম, কেন আপনি বাচ্চাগুলির ভবিষ্যত নষ্ট করতে যাচ্ছেন ?... আলি আকবর খানের কবিতা দেখেতো নজরুলের চক্ষুস্থির ! সে তখন তখনই তাঁকে তার বিখ্যাত 'লিচু চোর' লিখে দিল। এই কবিতা পেয়ে খান সাহেব আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠলেন। পরে এই 'লিচু চোর'ই নজরুলের অনেক দুঃখের কারণ হয়েছিল।...

সাহিত্যের মজলিশে খোসগল্প আর হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে আলি আকবরের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা বেশ গাঢ় হল। সরল সহজ

মানুষ নজরুল। কবিতা আবৃত্তি গান ছাড়া আর কিছুই জানেন না। আকবর সাহেব নজরুলের সাদামাঠা মনের খবর বোধহয় জানতে পেরেছিলেন। সকলের সামনেই একদিন তিনি প্রস্তাব করলেন: চলুন কাজী সাহেব, আমার সঙ্গে আমাদের দেশে কিছুদিন কাটিয়ে আসবেন।

আকবর সাহেবের প্রস্তাব নজরুলের মনে সাড়া জাগাল। সেই কবে কৈশোরে একবার তিনি পশ্চিম বাংলার চুরুলিয়া গ্রাম থেকে পূর্ব-বাংলায় গিয়েছিলেন। তখন তার ছাত্রজীবন। পূর্ব-বাংলার প্রকৃতির শোভা তার মনে তখনও জাগরুক। নদীঘেরা ধানক্ষেত, গাছে গাছে বিচিত্র পাখির কুজন। পদ্মা আর ধলেশ্বরীর বুকে মাঝিদের ভাটিয়ালী গান, মুহূর্তেই অনেক স্মৃতি, অনেক স্বপ্ন তাঁর মনকে দোলা দিল। কিন্তু মজলিশের ভাড়ে বসে আর পাঁচজনের মধ্যে তিনি আকবর সাহেবের আমন্ত্রণের কোনও উত্তর দিলেন না।

পরে কবি তাঁর বন্ধু মুজফ্ফর আহমেদকে আড়ালে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আকবর সাহেবের আমন্ত্রণে তিনি কুমিল্লায় যাবেন কিনা!

উত্তরে মুজফ্ফর সাহেব বলেন: আমার পরামর্শ যদি শুনতে চাও, তবে তুমি কিছুতেই আলি আকবর খানের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে যেও না। তিনি অকারণে অনর্গল মিথ্যা কথা বলে যান। যেন অভিনয় করছেন এই রকম একটা ভাব তাঁর কথাবার্তার ভেতর দিয়ে সর্বদা প্রকাশ পায়। কী মতলবে তিনি তোমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান, তাও কেউ জানেন না। তিনি তোমাকে একটা বিপদেও ফেলতে পারেন।

নজরুল বন্ধুর কাছে পরামর্শ চাইলেন। বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিলেনও। কিন্তু নজরুলের বিরাগী মন তা মানতে চাইল না। গোপনে তিনি আকবরের আমন্ত্রণে সায় দিলেন। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে অজানিত পথে তিনি একদিন পাড়ি জমালেন। যতদূর জানা যায়, ১৯২১ সালের মার্চ এপ্রিল অর্থাৎ চৈত্রের এক-

ভোরে তিনি আলি আকবরের সঙ্গে শিয়ালদা হয়ে কুমিল্লার পথে যাত্রা শুরু করেন।

নজরুল কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। কলেজ স্ট্রীটের সাহিত্যের আড্ডায় বন্ধুরা আসেন। কিন্তু নজরুলকে দেখতে পান না। তার সঙ্গে আলি আকবরও নিখোঁজ। সুতরাং, বন্ধু-বান্ধব সতীর্থদের মধ্যে এ নিয়ে গুঞ্জন সুরু হল। কিন্তু কবি কোথায়, কার সঙ্গে গেলেন, তার সঠিক হদিস কেউ খুঁজে পেলেন না। বন্ধুরা তাই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হলেন। নজরুলের খোঁজ নিতে চারদিকে চিঠি লেখালেখি সুরু করলেন।

এদিকে কলকাতার বন্ধুরা যখন নজরুলের খোঁজে উদ্বিগ্ন, নজরুল তখন কুমিল্লা সহরের এক হিন্দু পরিবারের বিশেষ অতিথি। বাড়ির কর্তা ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত। কুমিল্লা সহরের কান্দির পাড়ায় ঐ সেনগুপ্ত পরিবারের তখন সহরে খুব খ্যাতি আর সম্মান। পরিবারের ছোট বড় সকলেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তা ছাড়া লেখাপড়া আর গান-বাজনার কদরও ঐ পরিবারের কাছে খুব বেশি।

তরুণ কবি নজরুল ইসলামের নাম তাঁরা জানতেন। তাঁর কিছু কিছু দেশাত্মবোধক কবিতাও তাঁরা পড়েছেন। তবে তাঁর ব্যক্তি জীবন সম্বন্ধে যেমন তাঁরা বেশি কিছু জানতেন না, তাঁকে ঐ পরিবারের কেউ চিনতেনও না।

কিন্তু আলি আকবর খান ঐ পরিবারের সঙ্গে সুদীর্ঘদিন ধরে যুক্ত ছিলেন। গৃহকর্তা ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের একমাত্র ছেলে বীরেন্দ্রকুমার ছিলেন আকবরের সহপাঠী। সেই সুবাদে বীরেন্দ্রকুমারের মা বিরজা সুন্দরী দেবীকে আলি আকবরও মা বলে সম্বোধন করতেন। সুতরাং বীরেনের বন্ধু হিসাবে আকবরও ছিলেন সেনগুপ্ত পরিবারের পুত্রতুল্য।

ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারে লোকসংখ্যা ছিল নয়। তার মধ্যে তাঁর একমাত্র ছেলে ছাড়াও নিজের দুই মেয়ে কমলা এবং

অঞ্জলির সঙ্গে এক ভাইঝিও ছিল। নাম তার প্রমীলা। কমলা আর প্রমীলার বয়স তখন সবে বার এবং তের। ঐ দু'বোন স্থানীয় গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ে। দুই কিশোরী বোন মূলত লেখাপড়া নিয়ে থাকলেও গান বাজনায়ও তাদের খুব উৎসাহ ছিল। তারাও আলিদার সঙ্গে-আসা কবি ও সুগায়ক কাজীদাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ পেল। প্রথম প্রথম লজ্জায় কাজীদার কাছে তারা আসত না। দুই বোন আড়ালে থেকে কবিকে দেখত, তাঁকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করত। কবির বড় বড় চুল আর টানা টানা দীর্ঘ চোখ তাদের কিশোরী মনেও এক আশ্চর্য অনুভূতির ঢেউ তুলত। দুই বোন মিলে সুযোগ খুঁজত, কীভাবে কাজীদা'র সঙ্গে আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া যায়। কী করে তাঁর গান, তাঁর কবিতা তাঁর দরাজ গলায় আরও বেশি করে শোনা যায়।

ওদিকে কুমিল্লা সহরে খবর ছড়িয়ে পড়ল: কলকাতা থেকে কবি নজরুল ইসলাম এসে সেনগুপ্ত পরিবারে উঠেছেন। ক্রমে সহরের তরুণ তরুণীরা দলে দলে ভীড় জমাতে লাগল। দিনের পর দিন ভীড় বেড়েই চলল। নজরুলও হাসি, গান, আবৃত্তি আর খোস-গল্পে আসর মাতিয়ে রাখলেন।

তরুণ কবির জনপ্রিয়তায় এবং তাঁর গুণে গৃহকর্তা ইন্দ্রকুমার তো বটেই, তাঁর স্ত্রী বিরজা সুন্দরী দেবীও নজরুলের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। নজরুলের আচার আচরণ আর মধুর ব্যবহারে তাঁরা দারুণ খুশি হলেন। অল্প ক'দিনের মধ্যেই বিরজা সুন্দরী দেবী নজরুলকে আপন ছেলের মতই কাছে টেনে নিলেন। বন্ধুবর বীরেনের মা বিরজা সুন্দরী দেবী এবং তাঁর জ্যেঠিমা অর্থাৎ প্রমীলার মা গিরিবালা দেবীর আদর যত্নে কবিও অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। দেখতে দেখতে আপন গুণে কবি সেনগুপ্ত পরিবারের ঘরের মানুষ হয়ে গেলেন। প্রমীলা আর কমলার তাতে সবচেয়ে বেশি আনন্দ এবং লাভ হল, কারণ, সকাল-সন্ধ্যায় ওরা যেমন কবির কবিতা আবৃত্তি শোনে, তেমনি

আবার হারমনিয়ম নিয়ে কাজীদার কাছ থেকে গানের সুরও তুলে নেয়।

এমনি আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে চার-পাঁচ দিন কেটে গেল। গান আবৃত্তি হাসি-ঠাট্টায় কীভাবে কখন যে দিনগুলি পার হল, কেউই তা বুঝতে পারলেন না। সব দেখে শুনে আলি আকবরের মনে হয়তো কিছুটা ঈর্ষাও হল। তাই তিনি নজরুলকে বললেন: বেশ কদিন তো এখানে আনন্দ হল, এবার চলো আমাদের গ্রামের বাড়ি ঘুরে আসি।

আলি আকবর খানের বাড়ি ছিল কুমিল্লা সহর থেকে মাইল দশেক দূরের এক গণ্ডগ্রাম দৌলতপুরে। তাঁর মন কুমিল্লা ছাড়তে না চাইলেও, বন্ধুর কথায় সায় না দিয়ে তিনি পারলেন না। মনটা যেন কেমন বেসুরো হয়ে গেল। আনন্দ হাসির ঢেউ ছেড়ে শেষটায় কোথায় কোন পরিবেশে গিয়ে পড়বেন, কবির মনে তখন সেই ভাবনা। তবুও তো উপায় নেই। যার আমন্ত্রণে পূর্ববঙ্গে আসা, তাঁকে তো আর চটানো যায় না। কবি তাই আলি আকবরের প্রস্তাবে রাজী হলেন। এবং নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা সেনগুপ্ত পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দৌলতপুরের পথে রওনাও হলেন।

নজরুল চলে গেলেন। পাঁচটি দিন নয়তো, যেন কয়েক যুগ। সেনগুপ্ত পরিবারের সকলের মনেই যেন কেমন একটা বেদনা। কিশোরী প্রমীলা তার বোন কমলার সঙ্গে বসে কথা বলে। কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। হারমনিয়ম টেনে নিয়ে কবির দেওয়া গান আর সুর তুলতে বসেন। কিন্তু পারেন না। কীসের একটা অভাব যেন তাঁর কিশোরী মনে বেহাগের সুর তোলে। হারমনিয়মের রিডের উপর আঙুল রেখে কিশোরী প্রমীলা আনমনা হয়ে যায়। তারপর নিজের অজান্তেই জানালার পাশের পেয়ারা গাছটার দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবতে থাকে।

আচমকা নাড়া খেয়ে প্রমীলার সম্বিত আসে। পেছনে চেয়ে

দেখে বন্ধু-বোন কমলা। কী যেন বলতে চায়, পারে না। তারপর আবার হারমনিয়মে সুর তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাত আর চলে না। বোন কমলাকে কাছে টেনে বসায়। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে: কাজীদার চোখ দু'টো ভারী সুন্দর, টানা টানা। কী যেন জাদু জানেন কাজীদা, তাই না?

কমলা হাসে। বলে: বুঝতে পেরেছি দিদি, কাজীদা তোমার মন কেড়ে নিয়ে চলে গেছে, বলব মাকে?...

লজ্জায় নত প্রমীলা বোনকে জড়িয়ে ধরে। না, না, কিছু মনে করিস না। আমি অন্য কিছু ভেবে বলিনি।...

কমলা হাসে। বলে: অত ভাবনা কেন? শীগগিরই তো আবার ফিরে আসছে কাজীদা! যাওয়ার সময় তো তিনি বলেই গেলেন।

প্রমীলার অবুঝ প্রশ্ন: আসবে? কবে?

যেখানে যায় সেখানে কাজী একাই এক শ'। অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে সেই একই দশা। দলে দলে গ্রামের মানুষ এসে ভীড় করে। প্রাণখোলা হাসি-গান আর আবৃত্তি শুনে তারাও পাগল। দরাজ গলায় এমন গান আর কবিতা আবৃত্তি তারা আর আগে কোনদিন শোনেনি। দরাজকণ্ঠে রক্ত গরম করা যেমন বীরের সঙ্গীত, তেমনি সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে গজল গানের প্রাণ-মাতানো সুর। দেখতে দেখতে সাত গ্রামের মানুষ তাঁর গুণমুগ্ধ। মন্ত্রমুগ্ধ গ্রামবাসী প্রতিদিন আসে। কবিকে দেখে। ভক্তিভরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। আলি আকবরও কবির পরিচয় দিয়ে গ্রামবাসীর কাছে নিজের দাম বাড়ান।

আলি আকবর খানের বাড়ির অবস্থা খুব বেশি স্বচ্ছল না হলেও তাঁদের কোনও অভাব ছিল না। সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারই বলা চলে।

বাড়ির বড় কর্ত্রী ছিলেন আকবরের বিধবা বড়দি। তিনি তাঁর ভাইয়ের বন্ধু নজরুলকেও স্নেহ করতেন। বাড়ির ছোটরা কবিকে ভাইজান বলে সম্বোধন করে, তাঁকে ঘিরে থাকে। তিনিও গান আর ছড়া শুনিয়ে তাদের মসগুল করেন।

আলি আকবর খানের আরেক দিদিও তাঁদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। তিনিও বিধবা ছিলেন। তাঁর স্বামী মুন্সী আবদুল খালিক বেশ কিছুদিন আগেই মারা যান। তাঁর এক বিয়ের উপযুক্তা মেয়েও ছিল। তার নাম ছিল সৈয়দা খাতুন। বয়েস তখন ষোল কী সতের। সম্পর্কে সে ছিল আলি আকবরের ভাগনী। অর্থাৎ দিদির মেয়ে। তাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। অভাবী সংসার চালাতে বহুলাংশে তাঁরা আকবরের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কবিকে দেখতে তারা প্রায়ই ভাইয়ের বাড়ি আসতেন। সেখানে মাঝে-মাঝেই সকন্যা থাকতেন এবং খাওয়া-দাওয়া সারতেন।

সেদিন ছিল বৈশাখের মধ্যরাত্রি। আকাশে পূর্ণচাঁদ। নজরুল বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন। হাতে তাঁর বাঁশি। বাঁশি বাজাতেও কবি খুব ওস্তাদ ছিলেন। রাত্রির শোভায় মুগ্ধ কবি তাঁর বাঁশিতে সুর তুললেন। সুরে সুরে আকাশ বাতাস মুখর। গ্রামের মানুষ অবাক। কবিই নিশ্চয় বাঁশিতে সুর তুলেছেন। একে অপরকে জিজ্ঞেস করে আর বিছানায় শুয়ে শুয়েই বাঁশির সুরে মনের সুর মেলায়।

পরের দিন ভোরবেলা একটু দেরী করেই কবির ঘুম ভাঙল। চেয়ে দেখে তাঁর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবতী। চোখ রগড়াতে রগড়াতে গম্ভীর প্রশ্ন: কী চাই? তরুণী লজ্জায় আনতা। মুখে ভাষা নেই। কী যেন বলতে চায়। পারে না।

চোখ তুলে তাকালেন কবি। দেখলেন: আকবরের ভাগনী সৈয়দা খাতুন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

অবাক বিস্ময়ে কবি আবার প্রশ্ন করলেন: তুমি এই সাত সকালে?

সৈয়দার চোখে চোখ পড়তেই কবি তাঁর মনের ভাষা ধরে নিলেন। সুন্দর গড়ন। দীঘল দীঘল চোখ। এক মাথা কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল। তরুণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

কবি এবার যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বললেন: কই, কিছু বলবে নাকি?

কুমারী সৈয়দা একটু হেসে এদিক ওদিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল: গতরাত্রে কি আপনিই বাঁশি বাজিয়ে ছিলেন?

না, এর বেশি আর কিছু বলা সম্ভব হল না। ভয় আশঙ্কা প্রেম ভালবাসা আর শ্রদ্ধার মিলিতভাব তার কণ্ঠ রুদ্ধ করল। তারপর ত্রস্তপদে সে ঘরের বাইরে চলে গেল।

কবি নজরুল এবার কেমন যেন একটা নতুন অনুভূতির স্বাদ পেলেন। তিনি তরুণীর চলে যাওয়া পথের দিকে একমনে তাকিয়ে রইলেন। ঘুমভাঙা ভোরের আলোয় যার মুখচ্ছবি কবি দেখলেন, তাকে যেন এক আধফোটা ফুলের কলি বলেই মনে হল। সে ফুল হয়তো ফুটতে চায়। চায় আপন গন্ধ বিলাতে। তরুণ কবির ভাবের সাগরে প্রেমের ঢেউ উঠল। আপন মনে তিনি গুন-গুনিয়ে গান ধরলেন। একটি বিখ্যাত পারসি গানের কলি তাঁর মনে পড়ল। নার্গিস!...

পারসি ভাষায় নার্গিস হচ্ছে একটি সাদা রঙের সুগন্ধি ফুল। ভোরের আলোর অরুণ আভায় কুমারীর চোখে মুখে যেন তিনি ঐ নার্গিস ফুলেরই রূপ দেখতে পেয়েছেন। আপনভাবে কবি তাই বিভোর। আপন মনে তিনি আত্মস্থ। তারপরও কিছুক্ষণ চুপচাপ, নিশ্চুপ! কী যেন ভাবছিলেন। যুগ-যুগান্তের ভাবনায় আচ্ছন্ন কবি। প্রথম প্রেমের ফুল ফোটাতে কবি তখন সুনিপুণ মালী। আপন মনে তিনি বলে চলেন: নার্গিস, নার্গিস নামেই আজ থেকে

তোমায় আমি ডাকব। আমার বাঁশির সুর তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল? ফুলের কুঁড়ির মত তোমার সলাজ-সুন্দর মুখ যে আমার মন কেড়ে নিয়েছে। তোমায় আমি বাঁশির সুর শোনাব। তুমি আমার প্রাণ-মন আমোদিত করতে পারবে তো, নার্গিস?

নজরুলের এই প্রণয়-প্রেম প্রসঙ্গে কবিবন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নিজস্ব বয়ান :·· ইরাণের কবিদের বড় প্রিয় এই গুল্ম ও তার ফুল। কি করে তাঁরা নার্গিস-নজরুল এত তাড়াতাড়ি পরস্পরের মনের পরিচয় পেলেন, তা জানিনে। কিন্তু আমি যদি নজরুল ইসলামের মত বর্দ্ধমান জিলার লোক হতাম, তবে দৌলতপুর গ্রামের বুলি আয়ত্ব করতেই আমার কম পক্ষে একমাস লেগে যেত। কারণ, নার্গিস তখন অশিক্ষিতা ছিলেন। একেবারে নিরক্ষর নয়, তবে তার কাছাকাছি।···

একদিকে কুমিল্লার গ্রামে যখন নজরুল প্রেমের পূজায় বিভোর, অন্যদিকে কলকাতায় কবির বন্ধুরা তাঁর খোঁজে চঞ্চল অধীর।

প্রায় দু'মাস আগে কবি নজরুল সাহিত্যিক-সতীর্থদের না জানিযে আলি আকবরের সঙ্গে কুমিল্লা পাড়ি দিয়েছিলেন। তারপর তাঁর বন্ধুরা চারদিকে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। নানা মুখে নানা ধরনের সংবাদও পেয়েছেন। কিন্তু কবির সঠিক এবং প্রামাণ্য কোনও খবর তাঁরা বার করতে পারেননি। তাই সাহিত্যের মজলিশে, সম্পাদকদের দপ্তরে সর্বত্রই চাপা আলোচনা। প্রসঙ্গ : কবি নজরুল, তাঁর সন্ধান ইত্যাদি। কবি-বন্ধুরা যখন তাঁর সম্বন্ধে নানা ধরনের মুখরোচক গল্প শুনে উদ্বিগ্ন, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ কবির কয়েক বন্ধু তাঁর পত্র পেলেন। ঐ সব পত্রে নজরুল তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ জানিয়ে বিবাহ বাসরে তাঁদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানালেন। বিয়ের দিন নির্দিষ্ট হল : ৩রা আষাঢ়, ১৩২৭ অর্থাৎ ইংরাজি ২৮শে

জুন, ১৯২১ সাল। পাত্রীর নাম: নার্গিস, আলি আকবর খানের ভাগনী। বিয়ের বাসর দৌলতপুর, কুমিল্লা।

কবির পত্র পেয়ে বন্ধুরা সব হতবাক্। আকবর সাহেব সম্বন্ধে আগেই তাদের আশঙ্কা ছিল। তাঁদের সে আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নিল। বুঝতে পারলেন, আদর আপ্যায়ন করে ভুলিয়ে কেন আকবর সাহেব নজরুলকে গোপনে তাঁর দেশের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সব বুঝেও তখন তাদের আর কিছু করার রইল না। কেউ কেউ দুঃখ প্রকাশ করলেন। কেউবা কাজীর ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হলেন। তবুও তাঁরা স্থির করলেন, যে করেই হোক—কবি বন্ধুর বিয়েতে অন্তত একজনকে প্রতিনিধিরূপে পাঠাবেন। তার জন্য তাঁরা চাঁদাও তুলবেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য কাউকেই আর বিবাহ বাসরে পাঠানো সম্ভব হয়নি।

বিয়ের খবর পেয়ে ১৯২১ সালের ১৫ই জুন তারিখে মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেব নজরুলকে লিখলেন: ইতিমধ্যে আপনার কোনও পত্র পাইনি। ওয়াজেদ মিয়ার চিঠিতে জানলুম যে, ওরা আষাঢ় তারিখেই আপনার বিয়ে হচ্ছে।...সময় খুব সঙ্কীর্ণ। কাজেই আমার আর যাওয়া হচ্ছে না। তবে ভালয় ভালয় সব মিটে যাক্. এ প্রার্থনা আমি জানাচ্ছি....

বন্ধুবর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কেও কবি নজরুল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। ভিন্ন আর এক চিরকুটে নজরুল তাকে লিখলেন: এক অচেনা পল্লী-বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোনও নারীর কাছে কখনও হইনি।...

১৯২১ সালের ৫ই জুন পবিত্রবাবু তার উত্তরে লিখলেন: যখন তোর চিঠিতে জানলুম যে, তুই স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস, তখন অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর বয়স আমাদের চাইতে ঢের কম। অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ। Feeling-এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশি। কাজেই

ভয় হয় যে, হয়তো বা দু'টি জীবনই ব্যর্থ হয়! এ বিষয়ে তুই যদি Conscious, তা' হলে অবশ্য কোনো কথা নেই। যৌবনের চাঞ্চল্যে আপাত মধুর মনে হলেও ভবিষ্যতে না পস্তাতে হয়। তুই নিজে যদি সব দিক ভেবেচিন্তে বরণ করাই ঠিক করে থাকিস, তা' হলে আমি সর্বান্তকরণে তোদের মিলন কামনা করছি।...

আরেক পত্রে পবিত্রবাবু নজরুলকে যে কথাগুলি লেখেন, তাতেও স্নেহের সুর মাখা। বিয়ের দিন দশেক আগে তিনি লিখলেন: যাঁকে পেয়েছিস্, তিনিই যে তোর "চিরজনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী" একথা সত্যি, যদি এতটুকু সত্য হয়, তা' হলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যিই ঈর্ষা হচ্ছে। অবশ্য ইংরাজি-ফরাসী উপন্যাসে এরূপ নায়ক নায়িকার সঙ্গে ঢের পরিচয় হয়েছে, কাজেই তোর একথা আমি সত্যি বলে মেনে নিতে গররাজী নই।...

তোর বিয়েটা আমাদের একটা গল্পের প্লট হবে, এতে আর আশ্চর্য কি।

তরুণ নজরুল প্রেম-প্রণয়ের শেষে যখন বিয়ের বাসরে বসতে চলেছেন, বিদেশ বিভূঁয়ে তখন তিনি অভিভাবকহীন, নিঃসঙ্গ।

বিধবা মা তাঁর সুদূর বর্দ্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে। তিনি বা তাঁর পরিবারের কেউই কাজীর বিয়ের খবর জানেন না। সুতরাং অভিভাবকহীন অবস্থায় বিয়ের আগে বিদ্রোহী কবির বুকেও কেমন যেন একটা আশঙ্কা দেখা দিল। বিয়ের বাসরে তিনি কাউকে অভিভাবকরূপে পেতে চাইলেন। তারপর তাঁর মনে পড়ল কুমিল্লার সদ্য পাওয়া মা'র কথা। ক'দিন আগেই তো তিনি বিরজাসুন্দরী দেবীর কাছ থেকে পুত্র স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। তিনি তাই কালক্ষেপ না করে বিরজাসুন্দরী দেবীকে নিঃসঙ্কোচে সব জানিয়ে লিখলেন: তুমি না এলে আমার পক্ষে তো কেউ থাকছে না। তোমাকে আসতেই হবে।

পুত্রপ্রতিম নজরুলের পত্র পেয়ে বিরজাসুন্দরী দেবী মহা খুশি।

বাড়ির লোকজনও। কিশোরী প্রমীলা কেমন যেন একটু বিষণ্ণ। ক'দিন ধরেই কবির গানের সুর তুলে সে তাঁকে বেশি করে স্মরণ করছিল। সুতরাং তাঁর বিয়ের খবর তাকে একটু অপ্রস্তুত করল বৈকি। বোন কমলা প্রমীলার দিকে তাকায়। প্রমীলা চুপচাপ। মুখে কোনও কথা ফোটে না। দুই বোন আড়ালে গিয়ে চাপা স্বরে নানাকথা আলোচনা করে। বাড়ির বড়রা তখন সাজগোজে ব্যস্ত। নজরুলের আবদার তো আর ফেলে দেওয়া যায় না।

পরবর্তীকালে, ১৩২৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যায়, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় "নৌকা পথে" নাম দিয়ে বিরজাসুন্দরী দেবীর একটি ভ্রমণ কাহিনী বেরোয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২রা আষাঢ় তারিখে তারা দৌলতপুরে পৌঁছে ছিলেন। বিয়ের তারিখ ছিল ৩রা আষাঢ়। বরযাত্রী দলকে দৌলতপুর নেওয়ার জন্য স্বয়ং আলি আকবর খান কুমিল্লা গিয়েছিলেন। আর বিরজা-সুন্দরীকে পরিবারের সকলেই দৌলতপুরে বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, প্রমীলার তখন বয়স মাত্র তের। কিশোরী প্রমীলাও নজরুলের প্রথম বিয়ের আসরে অন্যতম বরযাত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিল।

নজরুলের আচম্‌কা বিয়ের খবরে কলকাতার বন্ধুরা যেমন চঞ্চল-অস্থির, তাঁর ভবিষ্যত ভাবনায়ও তাঁরা তখন বিচলিত। সুদূর প্রবাসে অচেনা পল্লীগ্রামের পরিবেশে তাঁর নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা ভেবে সকলেই উদ্বিগ্ন। তবুও তাঁরা কবির মঙ্গল কামনা করেন। দূরে বসে নির্দিষ্ট দিনে তাঁরা প্রার্থনা করেন ঃ ভালোয় ভালোয় কাজীর বিয়েটা যেন শেষ হয়। সরল সহজ কাজীর মন তো তাঁদের জানা। সহজেই মজে যান, অল্পতেই খুশি। আবেগ ভরে রাত্রিকেও দিন বলে বরণ করতে তাঁর বাধে না। শিশুর মত তার হাবভাব, সাদামাঠা মন।

কলকাতা আর কুমিল্লা। দুই প্রান্তের নজরুল শুভার্থীরা যখন তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন, সেই জীবন সন্ধিক্ষণে সত্যসত্যই এক সঙ্কট দেখা

দিল। তাঁর ঐ বিপদের দিনে তখন একমাত্র ভরসা বিরজাসুন্দরী দেবী। নজরুল তাঁর কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। চাপা ক্ষোভ আর উত্তেজনা নিয়ে বললেন: মা, এই রাত্রিই বোধ হয় আমার জীবনের কালরাত্রি হতে চলেছে। তুমি উপদেশ দাও, আমি কী করব। মায়ের পরামর্শের অপেক্ষায় ভিন্ন এক ঘরে অনুগত পুত্রের মত তরুণ নজরুল তখন বিরজাসুন্দরী দেবীর পায়ের কাছে বসে। তাঁর চোখে মুখে তখন দারুণ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ।

আষাঢ় মাস। ১৩২৮ সালের ৩রা তারিখ সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। হ্যাজাক লাইটে বিয়ে বাড়ি আলোয় আলোময়। আলি আকবর খানের নিজেরও পাঁচ গাঁয়ে নাম-ডাক ছিল। তাঁর ভাগনীর বিয়ে—তাদেরই বাড়িতে বিয়ের বাসর। পাত্র: সদ্য কলকাতা থেকে আগত সুদর্শন যুবক। নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতা গান আর বাঁশির সুরের মধ্য দিয়ে মাসখনেক আগে থেকেই তাঁর খ্যাতি কাছাকাছি সব গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং কবির বিয়ে শুনে বিয়ে বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন, আকবরদের বন্ধুবান্ধব পরিচিত জনের ভীড়ও বেশ জমে উঠল।

ওদিকে পাশের এক ঘর ভরতি মেয়েছেলে। পাত্রী সৈয়দা খাতুন। কবির দেওয়া নাম নার্গিস। তরুণ কবির ভাবীবধূকে ঘিরে বাড়ির ছেলেমেয়েরা। তাদের মধ্যে কমলা প্রমীলাও। এমন সময় আলি আকবর খান নার্গিসকে ইসারায় ডাকলেন। নার্গিস প্রথমটায় একটু অপ্রস্তুত। তারপর উঠে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মামা আকবর সাহেব ঘর ভরতি লোকের সামনে থেকে তাকে নিয়ে অন্য ঘরে গেলেন। উদ্দেশ্য: নজরুলের ভাবীবধূকে বিয়ের বাসরে যাওয়ার আগে তিনি নিজেই সাজিয়ে দেবেন।

বাড়ির অনেক লোকের কাছেই ব্যাপারটা বেশ বেমানান এবং রহস্যময় মনে হল। একে অপরের দিকে তাকালেন। কিন্তু কিছুই আর করার নেই। মামা তার ভাগনীকে সাজাবেন। তা'ছাড়া

যার উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় এই বিয়ে তার বিরুদ্ধে কোনও বক্তব্য রাখবে তেমন দুঃসাহসও কারোর হল না।

সরল নজরুলের মনও এবার দারুণ নাড়া খেল। কিছুদিন ধরেই তিনি এ ধরনের কিছু ঘটনা লক্ষ্য করছিলেন। ভেবেছিলেন ভাগনীর প্রতি মামার অপত্য স্নেহ অথবা অনাবিল ভালবাসা। কিন্তু বিয়ের বাসরের ঘটনা তাঁর মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাঁর মনে সন্দেহের চাঁদ উঁকি দিল। সতর্কতার সঙ্গে কবি আকবরের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য রাখলেন। এর আগে এমনভাবে তাঁর মনে আর সন্দেহ জাগেনি।

বিয়ের সন্ধ্যার ঘটনা তার মনে গভীর বেদনা আনল। আহত মনে নজরুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, আকবর সাহেবের ভালবাসা আর স্নেহ যেন কেমন বেশি মাত্রায় প্রকাশ পাচ্ছে! ভাবীবধূর সঙ্গে আকবর আলির বেশি মাত্রায় বাড়াবাড়ি আর মাখামাখি কবির মনে খেদ আর ক্ষোভের ঝড় তুলল। সন্দেহের মেঘ তাঁর মনের আকাশ স্বাভাবিক কারণেই ছেয়ে ফেলল।

নজরুল এত সত্ত্বেও নিরুত্তর, নিরুত্তাপ। কেউ কিছু বুঝতেও পারল না। ঘটনার পর ঘটনা। বিয়ের আসরে ভীড় যত বাড়ে, রাত্রির অন্ধকার যত গাঢ় হয়, আকবরের আচার-আচরণও কবির কাছে ততই তীব্র, দুর্বোধ্য ও রহস্যময় বলে মনে হয়। ওদিক কে যেন এসে তাঁকে বললেন, বিয়ের পর যাতে নজরুল নার্গিসকে নিয়ে আর কলকাতা না ফিরে দৌলতপুরেই ঘর-জামাই থাকেন, মেয়ের পক্ষ সে ভাবেই তৈরি হচ্ছেন। এ নিয়ে বিয়ের মজলিশেও যে আগে দু'চার কথা হয়নি, তা নয়। নজরুল আগেও তার প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ে অভিভাবকহীন নজরুলের সে প্রতিবাদের কেউই তোয়াক্কা করেনি। বরং তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে তাদের জবরদস্তির মনোভাবটাই বেশিমাত্রায় ফুটে উঠেছে।

বিয়ের রাত্রের নতুন ঘটনা-স্রোত তাই তাঁকে ভাবিয়ে তুলল।

মুহূর্তে তাঁর মন বিষিয়ে উঠল। বিতৃষ্ণ নজরুল এবার যেন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেন না। মনে তাঁর চাপা বিদ্রোহ জাগল।

বিয়ের মজলিশ ছেড়ে নজরুল উঠে দাঁড়ালেন। চোখে মুখে কোনরকম ক্ষোভ বা উত্তেজনার প্রকাশ নেই। শান্তভাবে তিনি গিয়ে একটি ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন, সেই ঘরে বসে আছেন বিরজাসুন্দরী দেবী ও তাঁর একমাত্র ছেলে বীরেন্দ্রকুমার। কবির দু'চোখে বেদনার জল বেরিয়ে এল। বিরজাসুন্দরী কবিকে কাছে টেনে নিয়ে পুত্রস্নেহে আদর করলেন। ভাবলেন, বিদেশে এসে বিয়ের পুণ্যলগ্নে হয়তো বিধবা মায়ের কথা মনে পড়ে থাকবে। তাই তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু নজরুল যে কিছুতেই শান্ত হয় না।

নজরুল মাথা তুলে বিরজাসুন্দরীর দিকে তাকালেন। তারপর নিঃসঙ্কোচে বলে চললেন: 'মা, তুমি আমায় রক্ষা কর। এখানে আর আমার এক মুহূর্তও থাকা চলবে না। এই বিয়ে আমার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেবে। আমি নার্গিসকে বিয়ে করব না!' বিরজাসুন্দরী নজরুলের কথায় আঁতকে উঠলেন। সে কী কথা! তিরস্কারের সুরে বললেন: ছেলেমানুষি করো না।

নজরুল বিরজাসুন্দরীর আরো কাছে এগিয়ে গেলেন। বললেন: জানো মা, ওরা আমার সঙ্গে বেইমানি করছে। আমি এতদিন তা' বুঝতে পারিনি। দারুণ এক চক্রান্ত!...

নজরুল প্রায় খোলা মনে পূর্বাপর বেশ কিছু ঘটনা তাঁর মায়ের কাছে নিবেদন করলেন। বিরজাসুন্দরীও সব শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ। ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে পৃথকভাবে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তিনি আলোচনায় বসলেন।

সেদিনের বিয়ে বাড়ির ঘটনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বিরজাসুন্দরী দেবী লিখেছেন: বিয়েতো ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল মধ্য-পথেই। এখন আমাদের বিদায়ের পালা...

পরবর্তীকালে নজরুলও ঐ বিয়ে প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু মুজফফর

আহ্মদকে লিখেছিলেন : বিয়ের কথা স্থির হতেই আলি আকবর খান্ ভাগনেয়ীকে নিয়ে পড়লেন। তাকে এর মধ্যেই গড়েপিটে দিতে হবে। তা' না হলে এতবড় একজন কবির যোগ্য স্ত্রী সে হবে কেমন করে ? অল্প ক'টি দিনের ভেতরে বেশি লেখাপড়া তাকে শেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। বেটাছেলে হয়ে শহরের মেয়েদের মত শাড়ি পরানোও তিনি শেখাতে পারবেন না। কুমিল্লা হতে নিমন্ত্রিতারা এলে সে কাজ তাঁরাই করতে পারবেন। অথচ নার্গিসের মন যাতে পরিণত হয়, সেই চেষ্টাই খান সাহেব একান্তভাবে করতে লাগলেন। তিনি তাঁকে শরৎচন্দ্রের লেখা হতে ও অন্যান্য লেখকদের লেখা হতে নারী চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ অংশ সমূহ পড়ে শোনাতে ও বোঝাতে লাগলেন। গড়নপিটনটা অতি মাত্রায় হয়ে যাচ্ছিল।...

(কাজী নজরুল ইস্লাম : স্মৃতিকথা)

সেদিন গোধূলি লগ্নে নজরুল যে সাধ আর স্বপ্ন নিয়ে বিয়ের বাসর রচনা করতে চেয়েছিলেন, মুহূর্তেই তা' ভেঙে খান খান হয়ে গেল। বিয়ের মজলিশে নজরুল আর ফিরে গেলেন না। মাতৃতুল্য বিরজাসুন্দরীর উপদেশ আর পরামর্শের জন্য তিনি পাশের ঘরে অসহায়ভাবে বসে রইলেন। তাঁর সঙ্গে সমবয়সী বন্ধু বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল, মুসলধারে। বাইরে যারা ছিলেন, তারাও ঘরে এলেন। বাসরঘরের ফুলের জলসায় বসে নার্গিস ততক্ষণে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। অদূরে বসে আলি আকবর নানা রসিকতায় ব্যস্ত। ঘরভর্তি মেয়েরা আনন্দে উতলা। চারদিকে আলোর রোশনাই। নববধূর পাশের আসনটি ফাঁকা। পাত্র এসে বসবেন। তার পাশেই রাখা হয়েছে একটি হারমনিয়াম।

বৃষ্টি থামল। একা এক ঘরে বসে এতক্ষণ হতাশ নজরুল

বন্ধুবর বীরেনের সঙ্গে সতর্কভাবে পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন। এবার বিরজাসুন্দরী এসে তাঁদের ঘরে ঢুকলেন। নজরুল মাথা নীচু করে বসে। বিরজাসুন্দরী তাঁর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তাই কিছু বলতে গিয়েও তা' প্রকাশ করতে পারলেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে এবার নজরুল বিরজাসুন্দরীর দিকে তাকালেন। বিরজাসুন্দরী দেবী এবার নিজেকে বেশ খানিকটা শক্ত করে নিয়ে বললেন: নুরু, আরেকবার নিজের মনকে, নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখ!

নজরুল উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললেন: মা আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ভবিষ্যত জীবন নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলা আর উচিত হবে না।

বিরজাসুন্দরীর মুখে এবার আর কোনও কথা সরলো না। তিনি নিরুত্তর, নিশ্চুপ হয়ে কী যেন ভাবছিলেন।

নজরুল আরেকটু সামনে গিয়ে তাঁর হাত ধরে অবোধ শিশুর মত বলল: মা, আমি এখনই এখান থেকে আত্মগোপন করে চলে যাচ্ছি।...

বিরজাসুন্দরী চমকে উঠলেন। তাঁর মাথাটা যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। পাশে তখন তাঁর ছেলে নজরুলবন্ধু বীরেনও দাঁড়িয়ে।

বিরজাসুন্দরী শান্তভাবে সস্নেহে বললেন: নুরু, তুমি বাইরের ছেলে। এদিককার পথঘাট কিছুই তো চেনো না। একে অন্ধকার তায় আবার বর্ষার রাত। একলা যাবে কী করে! যদি যেতেই হয়, তবে বীরেনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।...

নজরুল মায়ের আদেশ শুনে মুখ তুলে বিরজাসুন্দরীর দিকে তাকিয়ে কী যেন বলতে চাইলেন। বিরজাসুন্দরী বোধকরি নজরুলের মুখের ভাষা পড়তে পারলেন। তাকে আশ্বস্ত করে বললেন: হ্যাঁ, বীরেন তোমার সঙ্গেই যাবে। আমাদের জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই। আমাদের সঙ্গে তো কর্তাই রইলেন।...

না, আর কথা নয়। বিয়ের বাড়িতে তখনও আনন্দ-উচ্ছ্বাস, হৈ ও হুল্লোড় আর আলোর রোশনাই। নায়িকা নার্গিস সেজেগুজে ভাবীবধূর আসনে নায়কের প্রতীক্ষায় বসে। সেই চরম মুহূর্তে এক জামা এক কাপড়ে নায়ক নজরুল অতি সন্তর্পণে আষাঢ়ের মধ্যরাত্রির অন্ধকারে সকলের চোখে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর সেই অন্ধকার-পথের দুর্গম যাত্রার একমাত্র সঙ্গী হলেন বীরেন —বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত।

তারপর? নজরুলবন্ধু মুজফফর আহমদের ভাষায়ঃ···সেই কাদা-বিছানো পথে দশ-এগার মাইল পায়ে হেঁটে নজরুল আর বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কুমিল্লায় এসে পৌঁছুলেন ৪ঠা আষাঢ়ের সকাল বেলা। শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী লিখেছেন, দৌলতপুরে তাঁরা তিনদিন ছিলেন। তার মানে ২রা, ৩রা ও ৪ঠা আষাঢ় এই তিন দিন। ৪ঠা আষাঢ় দিবাগত রাত্রির গভীরে তাঁরা নৌকাপথেই আলি আকবর খানের বাড়ি ছেড়েছিলেন। বিয়ের বর উঠে চলে গেছেন। এজন্য গ্রামের লোকেরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারেন ভেবে তাঁদের দিনের বেলা রওনা হতে দেওয়া হয় নি।···

নজরুল পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন ব'লে নিজের জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি। সেগুলি বিরাজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গেই নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সঙ্গে সে সব নিয়েও ছিলেন তিনি। তবে তার ভিতর হতে আলি আকবর খান চিঠিপত্রগুলি ও অন্যান্য কাগজপত্র বার করে নিয়েছিলেন।···

নজরুল শেষ পর্যন্ত কুমিল্লা পৌঁছলেন এবং উঠলেন বিরজা-সুন্দরীদের বাড়িতেই। মাত্র দু'মাসের ব্যবধান। যে নজরুল একদা কুমিল্লা সহরের মানুষের কাছে উচ্ছল প্রাণের বন্যার প্রতীক ছিলেন, সেই তরুণ এবার যেন কেমন বিমর্ষ—বিষণ্ণ। সেনগুপ্ত পরিবারের লোকের কাছেও তিনি কেমন যেন লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকেন। মাঝে মাঝে প্রমীলা আসে। আসে কমলাও।

কিন্তু নজরুল আর বড় মুখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না। ইচ্ছা না থাকলেও নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেন। দৌলতপুরের ঘটনাপ্রবাহ প্রতিমুহূর্তে তার মনে বেদনা আর দুঃখের স্মৃতি জাগায়। নার্গিসের ব্যবহার, আর আলি আকবরের কপটতার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর বুকে জ্বালা ওঠে। প্রায় নির্বাক-নিস্তব্ধ অবস্থায় ঘরের কোণে বসে বসে তিনি কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের স্মৃতি রোমন্থন করেন।

কলকাতার বন্ধুরাও ততদিনে নজরুলের জন্য উদগ্রীব। সতীর্থ বন্ধু-বান্ধব নজরুল-নার্গিসের বিয়ে ভাঙার খবর পেয়ে গেছেন। আলি আকবর খান যে তরুণ কবিকে প্রতারণা করেছেন এবং কবি অতঃপর কুমিল্লা শহরের সেনগুপ্ত পরিবারের আশ্রয়ে আছেন, সে সংবাদ সাহিত্য-সমিতির অফিসে যথাসময়েই এসেছিল।

৩২ নং কলেজ স্ট্রীট। সেই পুরনো মজলিশ। নজরুল-বন্ধুরা সকলে এক সন্ধ্যায় জড়ো হলেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর কবির জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তিনি বীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের কাছে একখানা চিঠি লিখলেন। জানতে চাইলেন নজরুল বিষয়ে সর্বশেষ সংবাদ।

ডাকে চিঠি গেল। কিন্তু তাতেও সতীর্থদের দুশ্চিন্তা শেষ হয় না। অতঃপর ঐ দিনই তাঁরা স্থির করেন, কুমিল্লায় কাউকে পাঠিয়ে নজরুলকে কলকাতা নিয়ে আসা হবে।

নজরুলের সাহিত্যিক বন্ধুরা তখনও অর্থকড়ির দিক থেকে খুব একটা প্রতিষ্ঠিত নন। তাই তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুললেন। প্রায় ত্রিশ টাকার মত চাঁদা উঠল। অবশেষে সিদ্ধান্ত হল : মুজফফর আহমদ সাহেব কুমিল্লায় গিয়ে নজরুলকে নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন।

সিদ্ধান্ত মতই কাজ হল। মুজফফর সাহেব উদ্বেগ আর আশঙ্কা ভরা মনে কুমিল্লা গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর কুমিল্লা পৌঁছবার

তারিখটা ছিল ৬ই জুলাই, ১৯২১ সাল। বাংলা ২২শে আষাঢ়, ১৩২৮, বৃহস্পতিবার।

বন্ধুবর মুজফ্ফর আহমদকে দেখে কবি এক দিকে যেমন লজ্জায় মাথা নোয়ালেন, তেমনি আবার বিদেশ-বিভূঁইয়ে নতুন পাওয়া পুরাতন সুহৃদকে কাছে পেয়ে অসহায় নজরুল আনন্দ এবং ভরসাও পেলেন। বেশ কদিন পর তিনি প্রাণ খুলে কথা বলার সাহসও পেলেন। এক বেলাতেই তার বিমর্ষ আর বিষণ্ণ ভাব কেটে গেল। কৃতকর্মের জন্য তিনি বন্ধুবরের কাছে দুঃখ প্রকাশও করলেন। সরল-সহজ কবির মুখে মুখ রেখে মুজফ্ফর সাহেব স্মিত হাসি হাসলেন। তারপর বললেন: যা হয়ে গেছে তারজন্য আর আপশোস নয়! এবার অন্য কথা বল।

পরের দিন ছিল শুক্রবার, রথযাত্রা। কুমিল্লা সহরে রথযাত্রার উৎসব খুব জমজমাট হত। বিরাট মেলা মিলত। নজরুলের সাধ হল, রথের মেলায় ঘুরবেন। সব দুঃখ-বেদনা আর ক্লান্তিকর ঘটনার স্মৃতি ভুলবেন। মুজফ্ফর সাহেব ঐ প্রস্তাবে বেশ খুশিই হলেন। তারপর তাঁরা একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। উদ্দেশ্য, সারা সহর ঘুরে রথের মেলার আনন্দ উপভোগ করা। বিকেলের দিকে গাড়ি এল। তাঁরা সহর পরিক্রমায় বেরুলেন। তাঁদের সেই সহর-যাত্রায় সেনগুপ্ত পরিবারের যে সব শিশু-কিশোর সঙ্গী হল, তের বছরের প্রমীলা ছিল তার অন্যতমা।

শনিবার, ৮ই জুলাই, ১৯২১ সাল। তরুণ কবি নজরুলকে নিয়ে মুজফ্ফর সাহেব কুমিল্লা রেলস্টেশনে উপস্থিত। উপস্থিত এক বিরাট জনতাও। অল্পদিনের মধ্যেই তরুণ কবি কুমিল্লাবাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর গান-আবৃত্তি ছাড়াও, তিনি ঐ সময়ের মধ্যে কুমিল্লা সহরে কয়েকটি রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পরিবেশন করেছিলেন স্বদেশী-সঙ্গীত। বিদায়

সম্বর্দ্ধনায় গুণমুগ্ধ মানুষের ভীড়ে যেসব নেতা উপস্থিত ছিলেন, অনুশীলন দলের অতীন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁদের অন্যতম।

রেলগাড়ি ছাড়ল। সবাই হাত নেড়ে কবিকে বিদায় জানালেন। তরুণ কবির মুখে তখন আনন্দের হাসি। আর বুকে ভরা এক অনির্বচনীয় প্রীতির অনবদ্য স্মৃতি। সে স্মৃতির নায়িকা কিশোরী প্রমীলা; যাকে তিনি আদর করে ডাকতেন দুলি, দোলন অথবা দোলন চাঁপা।

১৯২১ সাল। সারাদেশে গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন মুক্তি-আন্দোলনের প্রস্তুতি। দেশজোড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ। অসহযোগের সেই প্লাবনের মুখে কবির কণ্ঠেও স্বদেশী গান, স্বদেশী সুর। তরুণ কবির সাহিত্যে গান্ধীজীর দারুণ প্রভাব। সাহিত্য-মজলিশ বসে। সেখানেও সেই একই প্রসঙ্গ। রাজনীতি, স্বদেশ-প্রেম, অসহযোগ এবং গান্ধীজী। গুরুত্বপূর্ণ-আলোচনার ফাঁকে তরুণ কবির মন কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে অনেক স্মৃতি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি মুখ। সে মুখ কিশোরী প্রমীলার। কিশোরীর প্রেম তাঁর মন যে কতটা কেড়ে নিয়েছে, কুমিল্লা ছেড়ে সুদূর কলকাতায় এসে কবি তা' অনুভব করতে পারেন। সব পেয়েও যেন তাঁর কিছুই পাওয়া হয়নি। না পাওয়ার বেদনায়, অথবা আশ্চর্য অনুভূতিতে তরুণ-মন চঞ্চল-অধীর হয়ে ওঠে। কলকাতার আসর, সাহিত্য-মজলিশ, বন্ধুবান্ধব সব কিছুই কেমন যেন মাঝে মাঝে অর্থহীন, বেমানান বলে মনে হয়। দেখে-আসা, সুদূর কুমিল্লায় রেখে-আসা একজোড়া দুষ্টু চোখের হাসি আর গোপন ইশারার স্মৃতি তাঁকে পাগল করে তোলে।

না, নজরুলকে কলকাতার মায়া আর ধরে রাখতে পারে না। দেখতে দেখতে বর্ষা শেষ হয়। বাদল-ঝরা রাতের নিঃসঙ্গ জীবন ক্রমে বিরহ বেদনার জ্বালা ভুলে যায়। প্রতীক্ষার রজনী শেষে আসে শরৎকাল।

শরতের সোনালী সকাল তরুণ কবির মনে নতুন আশার সুর নিয়ে আসে। নীল-ঘন-আকাশের দুধ-সাদা মেঘের ভেলার দিকে চোখ রেখে উদাস কবি প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে বিভোর হন। শরতের শিশির-ভেজা সকালে মনের কোনে কল্পনারা এসে ভীড় করে। কুমিল্লার সেই ছোট্ট সাজানো বাড়ি। উঠানের একপাশে শিউলি-গাছ। শিউলি-শেফালি কুড়াতে কুড়াতে কিশোরী প্রমীলা হয়তো তাঁর শাড়ির আঁচলে ফুলের পসরা সাজায়। কবি সেই স্বপ্নের ছবি আঁকতে বসে লিখে ফেলেন : শেফালিকা তলে, কে বালিকা চলে ?

কে সেই বালিকা, তা তো কবির অজানা নয়। শেফালি ফুলের গাছতলায় ফুল কুড়ানো প্রমীলার হাসী-খুশি মুখের স্বচ্ছন্দ ছবি যেন তিনি চোখের সামনেই দেখতে পান। একাই হাসেন, একাই ভালবাসেন। অনির্বচনীয় সেই অনুভূতি, অনবদ্য সেই স্মৃতি। স্মৃতির রোমন্থন আর প্রীতির আনন্দে তন্ময় কবির মন তখন কুমিল্লার পথে।

আবার কুমিল্লা।

মাত্র মাস দু'য়েকের ব্যবধান। কুমিল্লা গিয়ে এবারও প্রমীলাদের বাড়িতেই উঠলেন। প্রমীলা তখন স্থানীয় একটি সরকারী স্কুলের ছাত্রী। দুর্গাপূজার সময় প্রমীলাদের স্কুল ছুটি ছিল। প্রমীলা ও তার বোন কমলা কবিদাকে ঘিরে নতুন জগৎ রচনা করল। গান-আবৃত্তি, ছড়া-কবিতার ছড়াছড়ি। নজরুলের প্রাণে প্রেরণার জোয়ার এল।

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তখন তরুণ কবি দিশেহারা, আপন ভোলা। ঐ সময়ই তরুণ কবির মনে কিশোরী-প্রেমের অদৃশ্য স্পর্শ লাগে। এবং সেই গোপন প্রেমের অব্যক্ত ভাবই তরুণ কবি নজরুলের সৃষ্টির সাগরে প্রাণের বান আনে। মুজফ্ফর আহমদও তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :....১৯২১ সালের দুর্গাপূজার সময়ও সে কুমিল্লা গিয়েছিল। সেবারে সে অনেকদিন, প্রায় একমাসের

কাছাকাছি, সেখানে ছিল। তারপরে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কুমিল্লা গিয়ে তো সে প্রায় চারমাস সেখানে ছিল। 'প্রণয় সম্পর্ক' ইত্যাদি স্থাপনের ব্যাপার ঘটেছে এই শেষের দুইবারে।...

১৯২১ সাল; ১৭ই নভেম্বর। ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সেদিন ভারতে আসবেন। জাহাজে এসে নামবেন বোম্বাই বন্দরে!

সারাভারতে তখন রাজনৈতিক উত্তেজনা। ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবে দেশজোড়া প্রতিবাদের মিছিল। যুবরাজের আগমনের প্রতিবাদে সারাদেশে হরতালের ডাক দেওয়া হ'ল। কুমিল্লা শহরও তার বাইরে থাকল না। সেখানকার রাজনৈতিক নেতারা নজরুলের কাছে ছুটে গেলেন। অনুরোধ করলেন, ঐ উদ্দেশ্যে দেশাত্মবোধক গান লিখে দিতে। কবির মনেও ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। তিনি লিখলেন নতুন গান:

ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!...

গলায় হারমনিয়ম নিয়ে ঐ গান গাইতে গাইতে নজরুল কুমিল্লার রাজপথে নামলেন। তাঁর সঙ্গে শৈলেন সেন, উমেশ চক্রবর্তী, হেম ভট্টাচার্য সহ বহু রাজনৈতিক নেতাও গানে সুর তুললেন। কুমিল্লা সহরে রাতারাতি নজরুলের আরেক পরিচিতি—চারণ কবি। প্রমীলা এবং তাঁর পরিবারের চোখে মুখে গর্ব আর আনন্দের ঢেউ জাগে। রাজনীতি সচেতন সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে চারণ কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠতা আরও একমাত্রা বেড়ে যায়।

দ্বিতীয়বার কবি কুমিল্লায় গিয়ে দৌলতপুরের সব স্মৃতি নিদারুণভাবে মুছে ফেললেন। পূজাবকাশে কিশোরী প্রমীলার হাতেও অফুরন্ত সময়। একদিকে পূজার আনন্দ, অন্যদিকে কাজীদার

কবিতা আর গানে ভেসে বেড়ানো। অযাচিতভাবে অব্যক্ত প্রেম যেন হাতের কাছেই কে তুলে ধরেছেন। কিশোরী-মনে একটা নতুন স্বাদ, নতুন অনুভূতি জাগে। চঞ্চলা মনে সংশয় আর ভয়ও কম নয়। কত কথা মনে আসে, কত স্বপ্ন প্রমীলার দু'চোখে ভীড় করে, কিন্তু কিছুই যে সে প্রকাশ করতে পারেনা। চোখে চোখে কেমন যেন কথা হয়। নিজের অজান্তে নিজেই ধরা পড়ে যায়। তরুণ কবির চোখে-মুখেও না-পাওয়ার যন্ত্রণা আর বেদনা প্রকাশ পায়। কিন্তু কিছু প্রকাশ করা যায় না। শত হলেও হিন্দু বাড়ি। নিজে যতবড়ই উদার প্রাণ হোন কেন, বিজাতীয় পরিবার তাকে কতখানি প্রশ্রয় দেবে। স্নেহ-প্রীতি আর শ্রদ্ধা ভক্তি এক কথা। আর প্রেম-প্রণয় অন্য কথা। নজরুলের তরুণ মনেও নানা সংশয়-শঙ্কা, বিবেক দংশন আর অন্তর্দ্বন্দ্ব !

কবির গোপন ভাব ভাষার ফুল হয়ে বেরিয়ে আসে। কাব্যে-ছন্দে আর গানের সুরে প্রকাশ তাঁর কামনা বাসনা, কামনার গোপন সুর। কখন যেন লিখে ফেলেন :

হাসির ভাস,
ব্যথার শ্বাস,
চপল চোখ
আঁখির লাস,
নয়য়-নীর
অধর ফুল
রাতুল্ তুল
রাতুল্ তুল
দোদুল দুল
দোদুল দুল !

কিশোরী প্রেমিকার বাইরের রূপ অতি সহজেই ফুটে ওঠে তরুণ কবি নজরুলের ছন্দের দোলায়। তুলনাহীন ভাব আর ভাষায়

প্রেয়সীর রূপ নতুনরূপে ধরা পড়ে। প্রমীলা এক ফাঁকে কবিতাটি পড়ে নেয়। তারপর রাগতভাবে কাজীদার দিকে তাকিয়ে দ্রুত পায়ে পালিয়ে যায়। কিশোরীর মনে কেমন যেন এক দোলা জাগে। মনে মনে গর্বও বোধ করে। ভাবে, কাজীদা তো আচ্ছা লোক। হাসির ভাস যে ব্যথার শ্বাস, তা কী করে তিনি বুঝতে পারলেন! ভয়-লজ্জা, আশঙ্কা আর আনন্দের মিশ্রণে কিশোরীর মনে এক অব্যক্ত ভাব দেখা দেয়। কিন্তু তা' প্রকাশ করতে পারে না।

নজরুলও প্রমীলার মন বুঝতে পারেন। পরিবেশ পরিস্থিতি আর আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে বসে কী কবি ঐ কিশোরী তার মনের ভাব প্রকাশ করবে। মুখের ভাষা বুকে চেপে রেখেই যে কবির মনে আশার আলো জ্বালতে হবে তার প্রেয়সীকে। কবি তাই লেখেন:

যুগে যুগে এ পাষাণে বাসিয়াছ ভালো,
আপনারে দাহ করি' মোর বুকে জ্বালায়েছ আলো,
বারে বারে করিয়াছ তব পূজা-রিণী।
চিনি প্রিয়া চিনি তোমা, জন্মে জন্মে চিনি
তোমা চিনি।···

দেখতে দেখতে কবি তাঁর পূজারিণীকে চিনে ফেললেন। চির-পরিচিতা তাপস-বালিকার মধ্যে কবি খুঁজে পেলেন তাঁর জয়-লক্ষ্মীকে। লিখলেন:

চির-পরিচিতা তুমি, জন্ম জন্ম ধরে মোর
অনাদৃতা সীতা!
কানন—কাঁদানো তুমি তাপস-বালিকা
অনন্ত কুমারী সতী; তব দেব-পূজার বালিকা
ভাঙিয়াছি যুগে যুগে ছিঁড়িয়াছি মালা—
খেলা-ছলে, চিরমৌনা শাপভ্রষ্টা ওগো দেব-বালা!

নীরবে সয়েছ সবি—
সহজিয়া! সহজে জেনেছ তুমি, তুমি মোর জয়লক্ষ্মী,
আমি তব কবি।...

এমনিভাবেই তরুণ-কবি নজরুল আর কিশোরী প্রমীলার মধ্যে রাগ-অনুরাগ, প্রেম-প্রণয়ের গোপন পালা শুরু হয়। বাড়ির লোক কিছুই বুঝতে পারেন না। হয়তো বা বোঝেন। কিন্তু কেউ কিছু প্রকাশ করেন না। হয়তো ভাবেন, তরুণের চাপল্য এবং তরুণীর স্বভাবজাত ধর্ম ওটা। কেউই তার গভীরে যেতে চান না। বা যান না।

প্রায় একমাস কাটিয়ে কবি আবার কলকাতা ফিরলেন। উঠলেন ৩/৪ সি, তালতলা লেনে। সেখানে বন্ধুবর মুজফফর আহমদের সঙ্গে তিনি বসবাস শুরু করেন। সেটা ডিসেম্বর মাস। স্কুল-কলেজ অফিস-আদালতে তখন বড়দিনের ছুটি চলছে। নজরুল গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে একটি কবিতা লিখলেন। কবির শুতে দেরী হবে ভেবে মুজফফর সাহেব নিজে বিছানায় গেলেন। পরের দিন ভোরে নজরুল তাঁর রাত-জেগে লেখা কবিতাটি মুজফফর সাহেবকে পড়ে শোনালেন। ঐ প্রসঙ্গে মুজফফর সাহেব তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন :...তখন নজরুল আর আমি নীচের তলার পুবদিকের, অর্থাৎ বাড়ির নীচেকার দক্ষিণ-পূর্ব কোনের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার 'বিদ্রোহী' কবিতাটি লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন সময়ে তা' আমি জানিনে। রাত দশটার পর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি তখন সে আমায় পড়ে শোনাল। 'বিদ্রোহী' কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা।...

১৯২২ সাল। ৬ই জানুয়ারি। শুক্রবার। নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল।

বিদ্রোহী কবিতা সারা দেশে বিদ্যুতের স্পর্শ এনে দিল। পরাধীন জাতি এবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। বিজলি পত্রিকার চাহিদা বাড়ল। পর পর কয়েকবার ঐ পত্রিকা পুনর্মুদ্রণ করেও পাঠকদের চাহিদা মেটাতে পারল না। হাতে হাতে বিজলি, মুখে মুখে নজরুলের বিদোহী কবিতা। 'বল বীর বল চির-উন্নত মম শির'-এর সমবেত সুর সারাদেশে ধ্বনিত হল। 'বিদ্রোহী' কবিতার রচয়িতা বিদ্রোহী কবিরূপে সারাদেশে অভিষিক্ত হলেন। কুমিল্লার চারণ কবির নতুন পরিচয় হল বিদ্রোহী কবি। অগ্নি-তাপস নজরুল ধন্য হলেন। আনন্দে তিনি উদ্বেলিত। কলকাতার মানুষ যখন নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যায় অভিষিক্ত করলেন, কুমিল্লায় বসে সেনগুপ্ত পবিবারও সানন্দে সেই খবর সংবাদপত্রে পড়লেন। সারাদেশের মানুষের মুখে মুখে যখন নজরুল আর তাঁর বিদ্রোহী কবিতার কথা, কুমিল্লার কিশোরী প্রমীলার প্রাণে তখন বেদনার সুর। কবির আনন্দের দিনে, অভিষেকের দিনে সে যে দূরে, বহুদূরে বসে। নজরুলের মনেও হয়তো বিরহ বেদনার চাপা ক্ষোভ। বিদ্রোহী কবিও তো জানেন, তাঁর ঐ সুরছন্দ আর ভাবভাষার উৎস কিশোরীর প্রেম—প্রমীলার নীরব ভালবাসা। কবি তাই আবার যাত্রা করেন কুমিল্লার পথে।

১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে কাজী নজরুল বিদ্রোহী কবির খ্যাতি পান। চারদিকে তাঁর নাম ডাক। দারুণ খ্যাতি। আর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় তিনি কুমিল্লার পথে রওনা হলেন। এ নিয়ে কুমিল্লায় তাঁর তৃতীয় যাত্রা। কুমিল্লা গিয়ে আবার সেই গান-আবৃত্তি-ছড়া-কবিতার ছড়াছড়ি। সেখানে বসে কবি নানা প্রকৃতির কবিতা লিখলেন। মূলতঃ স্বদেশী-সঙ্গীত রচনাতেই তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হলেন।

সে সময় সারাদেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছে। পূর্ব-পশ্চিম দুই বাংলায়ও তার প্রবল জোয়ার। কুমিল্লার মানুষ গিয়ে

ভীড় করে নজরুলের কাছে তাদের দাবী : চাই গান, চাই কবিতা। রাজনীতির মঞ্চেও চাই্ বিদ্রোহী কবিকে।

কবির মন-প্রাণতো আগে থেকেই বিদ্রোহী হয়েছিল। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ আর খেদের সীমা ছিল না। নিয়মিত তিনি সারা ভারতের আন্দোলনের খবর রাখতেন। দেশনেতা গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান কবির মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের গোঁড়াতে অদেখা গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে কবিতা লিখে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে কবিতার মধ্য দিয়ে কবি গান্ধীবাদও প্রচার করলেন। কবি লিখলেন :

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়
ত্রিশকোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীনদেশের বাঁধন-বেদন
কে এলোরে করতে ছেদন ?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়॥
মরা মা'য়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আন্‌ল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই !
মুক্তি সে তো নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায়॥

শুধুমাত্র গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে লেখা কবিতাই নয়। কবির কণ্ঠে তখন স্বদেশ-সঙ্গীতের বিরামবিহীন সুর। রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি স্বরচিত সঙ্গীতের প্রাণ-মাতানো ঝঙ্কার তুললেন :

এস এস এস ওগো মরণ
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের ভর করগো হরণ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে।

তাতা তাথৈ তাতা তাথৈ তাদের বুকের' পরে
ভীমরুদ্রতালে নাচুক তোমার তাণ্ডব-ভরা চরণ

দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'!
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই যেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ!
সে দেশের বুকে শ্মশান-মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক নব নামকরণ॥

মাত্র ছয় মাস আগেকার কথা। কুমিল্লার দৌলতপুরে গিয়ে তিনি প্রেম প্রণয় করতে গিয়ে যেভাবে প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছিলেম, সেই সব স্মৃতি আর জ্বালা কবি বেমালুম ভুলে গেলেন। কুমিল্লায় তারপর যতবার নজরুল যান, ততবারই তাঁর বিরাট সম্বর্দ্ধনা। চারণ কবিকে বিদ্রোহী কবির আসনে বসিয়ে সেখানে চলে পালা বদলের গান। দেশের মুক্তির জন্য যে জন জাগরণ, কবি যেন তাদের পুরোধা।

ওদিকে কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের মধ্যেও গান্ধীজীর দারুণ প্রভাব। বাড়ির বড়রা গান্ধীজীর ভাব-শিষ্য এবং অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয় শরিক। আর ছোটরা স্বদেশী সঙ্গীত-আবৃত্তিতে মুখর। তাদের প্রেরণা দেন কবি নজরুল। যতদূর জানা যায়, প্রমীলা এবং কমলা, দুই বোন, নজরুলের প্রভাবেই অসহযোগ আন্দোলনের মুখে স্কুল ত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকে তারা সক্রিয়ভাবে নজরুলের শিষ্য। তবে সরাসরি রাজনীতির চেয়ে তাদের কাছে স্বদেশী সঙ্গীতই ছিল বেশি লোভনীয় এবং প্রিয়।

শুধু স্বদেশী সঙ্গীত কেন। কবির মনে তখন প্রমীলার প্রভাবও দারুণভাবে পড়েছিল। তাই নানা সৃষ্টির মধ্যে বেশকিছু গীতি-

কবিতাও কবি ঐ সময় লিখেছিলেন। লিখলেন :

যাস্ কোথা সই একলা ও তুই অলস বৈশাখে ?
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কই কাঁখে ?
সাঁঝ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকুল নাচায়ে
পুকুর পারে ঝুমুর ঝুমুর নুপুর বাজায়ে
যাসনে একা হাবা ছুঁড়ী
অস্ফুট জবা চাপা কুঁড়ি।...ইত্যাদি

কবির কণ্ঠে তখন একদিকে যেমন স্বদেশ প্রীতির সুর বাধা গান, অন্য দিকে তেমনি প্রেম-প্রণয় আর প্রীতির রসে সিক্ত কবিতার আবৃত্তি। স্বদেশী সঙ্গীতের শ্রোতা জাগ্রত জনগণ। আর প্রেম-প্রীতির গীতি-কবিতার আবৃত্তির শ্রোতা দুইজন, প্রমীলা আর কমলা। নজরুলের গান আর কবিতা প্রমীলা-কমলা গুণমুগ্ধের মত মাথা নীচু করে শোনে। চোখে মুখে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু আড়ালে গিয়ে দুইবোন হাসে। লজ্জা আর শঙ্কার হাসি প্রমীলার মুখে ফুটে উঠে। কিশোরী প্রমীলার মন কাজীদার কবিতার নীরব আবেদনে নরম হয়। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু প্রকাশ করতে পারে না। এমনি করে আবেদন-নিবেদন, আর রাগ-অনুরাগের পালা শুরু হয়। প্রমীলা-কমলার অভিভাবকরা রাজ-নীতির আলোচনায় মেতে থাকেন। মাঝে মাঝে কবিকে ডেকে তাঁর স্বদেশী সঙ্গীত অথবা আবৃত্তি শুনে তাঁকে সাধুবাদ জানান!

কদিন পরের ঘটনা। কুমিল্লা সহরে গান্ধীজী এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে এক গণ মিছিল নামাতে বিরজাসুন্দরী দেবী উদ্যোগী হলেন। সুসজ্জিত, সংগঠিত মিছিল করার জন্য তিনি নিজে সব দায়িত্ব নিলেন। নজরুলকে মিছিলে গান গাইতে বললেন। মা'য়ের নির্দ্দেশে কবি গর্ববোধ করলেন। সানন্দে সেদিন হারমনিয়াম গলায় নিয়ে নজরুল রাজপথে নামলেন সুর তুললেন :

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ সব শ্মশানে শিব নাচে—
ঐ ফুল ফুটানো পা ফেলে ?…

সাক্ষাৎ গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত প্রশ্ন। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাল কুমিল্লার সাধারণ মানুষ। আগে কবি। পেছনে বিরাট শোভাযাত্রা। সেই ভীড়ে বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে কমলা-প্রমীলাও সারা সহরে সেদিন নানা গান, নানা সুর। শোভাযাত্রার পুরোভাগে হারমনিয়াম কাঁধে কবি। জনতা ভেঙ্গে পড়ল। বাড়ি ফিরে বিরজাসুন্দরী নজরুলকে আশীর্বাদ করলেন। কবি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালেন বিরজাসুন্দরী দেবীকে, তাঁর মা'কে। পাশেই ছিল প্রমীলা। সব দেখে তার আর আনন্দ বাধ মানে না। মনের সমস্ত আবেগ মুহূর্তেই উপ্‌চে পড়তে চায়। সেইদিন কাজীদার প্রতি তার আকর্ষণ আরও অনেকগুণ বেড়ে গেল। নজরুলও প্রমীলার চোখে হাসি-হাসি চোখ রাখলেন। নিমেষে হাজারো কাথার বিনিময় হয়ে গেল। নীরব ভাষার মধ্য দিয়ে তরুণ কবি আর কিশোরী প্রমীলার মনও হয়তো বিনিময় হয়ে গেল। এতদিনকার চাপা ভয় আর আশঙ্কার কুয়াশা এবার হয়তো দূর হল। প্রেম-প্রণয়ের সূর্য সবে ভোরের আলো ছড়াতে শুরু করল। সেই আলোয় অভিষিক্ত হলেন দুইজন। একজন কবি, আরেকজন কবি-মানসী।

সেবার কুমিল্লায় গিয়ে কবি এক নাগাড়ে প্রায় তিন মাস কলকাতাকে ভুলে রইলেন। কিশোরী প্রমীলার প্রেমের আলো তরুণ কবির সৃষ্টির সাগরে তুফান তুলল। একের পর এক গান-কবিতা, কাব্য গীতিতে তিনি মুখর। ওদিকে কলকাতায় বন্ধুরা আবার চিন্তিত। আবার তাদের উদ্বেগ-উত্তেজনা। নানা মুখে

তাঁরা নানা খবর শোনেন। কেউ বা মন গড়া রোমাঞ্চকর গল্প কেঁদে কবির অপপ্রচারে মেতে ওঠে।

'মোসলেম ভারত' অফিসে বসে একদল কবি সাহিত্যিক সাহিত্য আলোচনায় ব্যস্ত। সম্পাদক আফজাল হক সাহেব একটি খাম খুলে একটু মুচকি হাসি হাসলেন। তখনও তাঁর মুখে কোন শব্দ নেই। আরও গভীর আগ্রহ নিয়ে তিনি খাম্‌-খোলা চিঠিখানি পড়লেন। তারপর উপস্থিত সকলকে বললেন: না, তোমাদের আর দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

মুজফ্ফর সাহেব এবং অন্যান্য সকলেই অবাক। সে কী কথা। কী খবর পেলেন সম্পাদক মশাই?

আফজল সাহেব বললেন: নজরুল প্রেমে পড়েছে।

নজরুলের আবার প্রেম? প্রায় সমস্বরে সকলের আশ্চর্য প্রশ্ন!

সম্পাদক মশাই বললেন: সবুর করুন। তা' হলেই সব ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। কবির বন্ধুরা উৎসুক হয়ে বসলেন। সম্পাদক আফজাল সাহেব সকলকে বিস্মিত করে ঘোষণা করলেন: নজরুল কুমিল্লা থেকে একটি কবিতা আর সঙ্গে একটি গান লিখে পাঠিয়েছে। অনুরোধ গানখানি যেন মোসলেম ভারতে ছাপা হয়। বলেই সম্পাদক মশাই তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে নজরুলের পাঠানো গানখানির আবৃত্তি শুরু করলেন:

হে মোর রাণী তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার চরণ-তলে এসে॥
আমার সমরজয়ী অমর তরবারি—
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে হয়ে উঠে ভারী,
এখন এভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হারমানা হার পরাই তোমার কেশে॥
ওগো জীবন-দেবী,

আমায় দেখে কখন তুমি ফেললে চোখের জল,
(আজ) বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল।
(আজ) বিদ্রোহীর এই রক্ত রথের চূড়ে,
বিজয়িনী! নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আজ তোমার মালায় পুরে,
(আমি) বিজয়ী আজ নয়ন জলে ভেসে॥

সম্পাদক মশাই গানখানির আবৃত্তি শেষ করলেন। কবি-বন্ধুরা একবাক্যে রচনার তারিফ করলেন।

মুজফ্ফর সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন: নজরুলতো সুন্দর একখানি গান লিখে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে আবার প্রেম-টেমের কী আছে?

আফজাল সাহেব এবার হাসলেন। তারপর হাতে চিরকুটটুকু নাড়িয়ে বললেন: নজরুলের পাঠানো গান আর এই চিঠি পড়ে আমার মনে হচ্ছে প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের প্রেম বেশ গভীরভাবে জমেছে? এবং নজরুল প্রমীলাকে বিয়ে করবেনই।

কেউ কেউ প্রতিবাদ করলেন। কেউ বা বললেন: ছন্নছাড়া নজরুল আবার ঘর বাধবে, তবেই হয়েছে। কেউবা বললেন, প্রমীলার বয়েস তো মাত্র চৌদ্দ। কবি কি তা' হলে বালিকা-বধূ নিয়ে ঘর বাঁধবেন?

কবির বন্ধুরা নানাভাবে নানা মত-মন্তব্য প্রকাশ করতে লাগলেন। কবির পাঠানো গানখানি 'বিজয়িনী' শিরোনামায় মোসলেম ভারতে ছাপা হ'ল। রোমান্টিক ঐ রচনার মধ্যে দেশবাসী বিদ্রোহী কবির আরেক রূপ দেখতে পেল। বিদ্রোহী এবার নিবেদিত। ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত নজরুলের চরিত্র মানস বিশ্লেষণে লিখেছেন···বিজয়িনী কবিতাটির অন্তরে ভারতীয় ঐতির্হ্যে লালিত নজরুলের প্রেম-সাধনার একটি বিশেষ রূপ চিত্রিত। কবির বিজয়িনীরাণী তাঁর আকাঙ্ক্ষিত মানবিক প্রেমের জীবন্ত প্রতিমা

ব্যতীত অন্য কিছু নয়। বিদ্রোহী কবি যুদ্ধজয়ী তরবারির ভার-বহনে অসমর্থ হয়ে তাঁর প্রেম-প্রতিমার কাছে ধন্না দিয়ে শান্তিলাভ করতে ইচ্ছুক।…

নজরুলের জীবনেও যেমন, কাব্যেও তেমনি প্রেম মুখ্য বস্তু। এই প্রেম লাভের জন্যই তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রোহ। আবার এই প্রেমের বিচিত্র রূপের মধ্যে তাঁর অশ্রু কোমল রূপের প্রতিই কবির আকর্ষণ সব চেয়ে বেশি। কবির প্রেমাস্পদা তাঁকে দেখে সমব্যথায় অশ্রু বিসর্জ্জন করায় বিশ্বজয়ীর দেউল টলমল করে উঠল। বিদ্রোহী কবির রক্ত-রথের চূড়ায় বিজয়িনীর নীলাম্বরীর আঁচল উড়ল এবং তিনি তাঁর তূণ নিঃশেষ করে বিজয়িনীর জয়মাল্য রচনা করলেন। বস্তুত প্রেমাস্পদার প্রেমে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে কবি সত্যকার বিজয়ী হলেন।

কবি নজরুলের প্রেমে ছিল গভীরতা আর সার্বজনীনতা। তিনি এক সময় লাল কালিতে তাঁর সব চিঠিপত্র, গল্প কবিতা লিখতেন প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলতা স্মৃতি নামে তরুণ নজরুল একটি সুন্দর প্রেমের কবিতাও লিখেছিলেন। বাংলা ১৩৩০ সালের (১৯২৩) পৌষ সংখ্যা 'কল্লোলে' কবির সেই বিখ্যাত প্রেমের কবিতাটি প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে লেখেন:

ঐ রাঙা পায়ে রাঙা আলতা প্রথম যেদিন পরে ছিলে,
সেদিন তুমি ভুলেও কিগো আমায় মনে করে ছিলে—
আলতা যেদিন পরেছিলে ?

কল্লোলে প্রকাশিত নজরুলের এই কবিতাখানি প্রকাশ করে কবির পরিচিতি সম্বন্ধে তাঁর পাশে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা ছিল: কবি নজরুল ইসলাম তাঁর চিঠিপত্র, গল্প-কবিতা, সব লাল কালিতে লেখেন। এবার বুকের রক্ত দিয়ে আলতা-স্মৃতি লিখেছেন। যারা এমনি ধারা একজনের বুকের রক্ত দিয়ে নিজের পায়ে আলতা পরে, কবি তাদের হাসতে হাসতে বলেছেন, আমারই বুকের রক্ত দিয়ে

'তুমি যুগে যুগে আল্‌তা পরছ নারী, রক্ত নিয়ে খেলা এবার সাঙ্গ কর।...

নজরুলের এই আলতা-স্মৃতি যখন কল্লোলে প্রকাশিত হয়, তার আগেই কবি প্রমীলার প্রেমের সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের প্রথম দেখা। ১৯২৪ সালের এপ্রিলে নজরুল-প্রমীলার বিয়ে। সুদীর্ঘ এই চারটি বছর রাগ-অনুরাগ, প্রণয়-প্রেমের লুকোচুরি খেলা চলেছিল তাঁদের মধ্যে। আর তাঁরই আনন্দে আর উৎসাহে কবি মেতেছিলেন সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবনে দেশ যত বেশি প্লাবিত হয়, তরুণ কবির মন ততই অশান্ত-চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিদেশী শক্তি ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে তাঁর মনে ক্ষোভ আর বিদ্রোহ দেখা দেয়। শুধু কবিতা লিখে বা স্বদেশী গান গেয়েই নয়, সক্রিয়ভাবে কী করে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে পরাধীন দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব, তিনি তা নিয়ে রীতিমত চিন্তা-ভবানা শুরু করেন। তরুণ হৃদয়ের প্রেম-প্রণয়ের আবেগ মুহূর্তে গতিপথ পরিবর্তন করে। নজরুল মনে করেন, আর বেশিদিন প্রেমের বাধনে আটকে থাকলে চলবে না। তাঁর ব্যক্তিপ্রেম দেশপ্রেমে পরিণত হয়। তারপর কুমিল্লা ছেড়ে নজরুল আবার কলকাতার পথে যাত্রা করেন।

১৯২২ সালের আগস্ট মাস। নজরুল স্থির করলেন একটি পত্রিকা বার করবেন। নাম হবে তার 'ধূমকেতু'। ধূমকেতু সাহিত্য পত্রিকা হলেও, তার মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশ-মন্ত্রের দীক্ষা দিতে হবে। কাব্য-কবিতা, গল্প-প্রবন্ধ দিয়ে মানুষের মনের চাপা ক্ষোভ দাবানলে পরিণত করতে হবে।

অগ্নি-তাপস প্রেমিক কবি নজরুল কবিগুরুর কাছে আশীর্বাণী চাইলেন। শুভেচ্ছা বাণী প্রার্থনা করলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কাছে। তাঁরা সানন্দে

তরুণ কবিকে উৎসাহ দিলেন। রবিঠাকুর 'ধূমকেতুর' আগমনী গেয়ে নজরুলকে লিখলেন :

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গ-শিখরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন !
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দেবে চমক মেরে,
আছে যারা অর্দ্ধ চেতন !

কুমিল্লা ফেরত কবি আবার কলকাতা মাত্ করলেন। কবি-বন্ধুরা অবাক। তাঁদের আশঙ্কা আর আফশোস ছিল : বে-হিসেবী কাজীটা প্রেম করেই বোধ হয় শেষ হয়ে যাবে। তাঁর দ্বারা আর কাজের কাজ কিছু হবে না। কিন্তু এবার তাঁরাও নড়ে চড়ে উঠলেন।

১৯২২ সালের ১২ আগস্ট। তাঁর পরিচালনায় ধূমকেতু বেরুল। নিজে ছদ্মনাম নিলেন সারথি। কাগজ বেরুতেই কলকাতায় দারুণ প্রতিক্রিয়া। প্রতিটি লেখার মধ্যে যেন আগুণের উত্তাপ। দেখতে দেখতে ধূমকেতু জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ধূমকেতুর হঠাৎ ঝল-কানিতে কুমিল্লার মানুষও চম্‌কে উঠল। চম্‌কে উঠল সারা বাংলা। প্রমীলার আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁর প্রাণপুরুষ এবং প্রিয়তমের পরিচালনায় জনপ্রিয় পত্রিকা! তাকে আবার আশীর্বাদ করেছেন বিশ্বকবি, কথাশিল্পী আর মহাবিপ্লবীরদল। দূরে বসেই প্রমীলা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। আর কল্যাণ কামনা করে অগ্নিতাপসের।

দেখতে দেখতে মাস দুয়েক পার হল। মনের ক্ষোভ আর

পরাধীনতার জ্বালা যেন প্রতিদিনই নজরুলকে দগ্ধ করে। অক্টোবরের ১৩ তারিখের ধূমকেতুতে তিনি লিখলেন :

…সর্ব প্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। কেননা, ও কথাটার মানে এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজ্য বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে, দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনতেন না। তাঁদের অতক সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।…

কবির এই লেখা পড়ে সারাদেশ বিস্মিত। এতদিন কবি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের একজন অনুগামী ছিলেন। স্বরাজের জন্য তিনি স্বদেশী সঙ্গীত লিখেছেন, গেয়েছেন। কিন্তু এবারের ভাষায় বিপ্লবের ডাক। পূর্ণ স্বাধীনতার সুস্পষ্ট দাবিতে তরুণ কবির উদাত্ত আহ্বান। সারাদেশে সাড়া পড়ে গেল। মুখে মুখে আবার কবির নাম। ঘরে ঘরে কবির নতুন আহ্বান বাণী!

প্রমীলা আর তার পরিবারের সকলের চোখে-মুখেও বিস্ময়ের চমক্। কুমিল্লার মানুষ তরুণ কবির জ্বালাময়ী ভাষায় আবেগ রুদ্ধ। নতুন করে কুমিল্লার মানুষ আবার স্বাধীনতার শপথ নেয়। দলে দলে ছুটে যায় কান্দিপাড়ায় সেনগুপ্ত পরিবারে, তাদের অভিনন্দিত করতে, ঐ পরিবারের জন্যই যে তারা কবি নজরুলকে কুমিল্লায় পেয়েছেন। বিদ্রোহী কবিকে তারা কুমিল্লার আপনজন বলেই গ্রহণ করেছেন। তাই অগ্নি তাপসের নতুন যাত্রায় তারা কম গৌরবান্বিত নয়।

দিন যায়। খবরের পর খবর। একের পর এক চমক। বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামা তখন নজরুল ইসলাম। কিশোরী প্রমীলার মনেও তাই আনন্দ আর আনন্দ। উপচে পড়া আনন্দ সে আব ধরে রাখতে পারে না। প্রমীলা তাই আপন মনে গুণগুণিয়ে কবিরই শোনানো গানের সুর তোলে :

সুতো কেটে মোরা স্বাধীনতা চাই,
বসে বসে কাল গুণি-
ওঠরে জোয়ান বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি !...

কাজী নজরুল ইসলাম এতদিন কবি হিসাবেই খ্যাত ছিলেন। বিদ্রোহী কবিতা লিখে তিনি বিদ্রোহীকবির আসন পেলেও পুলিশের খাতায় তাঁর পরিচিত ছিল একজন স্বদেশী-করা কবি হিসাবে। কিন্তু 'ধূমকেতু'র কবি নজরুলের নামে এবার পুলিশ নতুন খাতা খুলল। তাঁর পরিচয় শুধু মাত্র আর স্বদেশী-করা কবি নয়। দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী হল তাঁব নতুন পরিচয়। তাই চোখে চোখে বাখা হয নজরুল ইসলামকে। পুলিশ প্রশাসনের ভয়, হয়তো সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলতে পারেন জনপ্রিয় ঐ রাজদ্রোহী কবি।

বর্ষার শেষে শরৎ এল। নীলঘন আকাশে দুধ-সাদা মেঘেদের আনাগোনা। শিশির ভেজা শিউলি ফুলের গন্ধে ভোরের প্রকৃতি উতলা। আকাশে বাতাসে কেমন যেন পূজা-পূজা গন্ধ। আর তো মাত্র একটি মাস বাকী।

ধূমকেতুর পরিচালক ভাবেন, পূজা তো এল। চারদিকে উৎসবের প্রস্তুতি। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও রচনার নৈবিদ্যে শারদীয়া সংখ্যা সাজানো হবে। তবে ধূমকেতুই কেন তা থেকে বাদ যাবে? তিনি স্থির করলেন, ধূমকেতুর শারদীয়া সংখ্যা নতুন নৈবেদ্য সাজাবেন।

গান্ধীবাদী আর বিপ্লববাদীদের আন্দোলনে তখন সারা দেশ মথিত। পুলিশ ধরে ধরে দেশ কর্মীদের জেলে পুরছে। অপরাধ—স্বাধীনতার দাবি। স্বদেশভূমির মুক্তির জন্য কথা বলা। তা' ছাড়া এখানে ওখানে স্বদেশী-করা মানুষের উপর বিদেশী শাসকদের চলছে অত্যাচার উৎপীড়ন। নজরুল তাই 'ধুমকেতুর' পূজা সংখ্যা সাজাতে বসে নিজ হাতেই এক অনবদ্য কবিতা লিখলেন। না, কবিতা ঠিক নয়, ছন্দে লেখা জ্বালাময়ী ভাষার নালিশ-পত্র বলা চলে। ঐ কবিতাপত্র লিখলেন তিনি অসুর নাশিনী দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে।

ধুমকেতুর শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হল। তাতে কবির লেখা ঐ নালিশ-পত্রের অগ্নিক্ষরা বয়ান :

আর কত কাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে,
অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।
দেব শিশুদের মারছে চাবুক
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি—
ভূ-ভারত আজ কসাই খানা
আসবি কখন সর্বনাশী?...

দেশবাসীর চাপা ক্ষোভ এবার দাবানল হয়ে উঠতে চাইল কবির ঐ কবিতা তাদের মনের ক্ষোভ আর বেদনাকে দারুণ ভাবে নাড়া দিল। ইংরাজ-সরকার বুঝল, কবি আর তাদের নিশ্চিন্তভাবে রাজত্ব চালাতে দেবেন না। তাঁর রচনা আর ভাষা দেশবাসীকে স্বদেশ-সচেতন করে তুলছে। তাই আর দেরী হল না। সঙ্গে সঙ্গে ধুমকেতুর ঐ সংখ্যাগুলি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হল। আর কবির বিরুদ্ধে বেরুল গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

চারদিকে পুলিশ আর পুলিশ। সাদা পোষাকেও গোয়েন্দারা নজরুলের খোঁজে নেমে পড়ল। কিন্তু নজরুল বেপাত্তা। হাজার

হাজার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কখন যে কী ভাবে কবি কুমিল্লা পাড়ি দিয়েছেন কেউ তা জানতেও পারল না।

কবি তখন কুমিল্লায় আত্মগোপন করে রইলেন। ঐ সঙ্কটময় অথচ রহস্য ভরা দিনগুলোয় প্রমীলার প্রেম তাতে উদ্দীপ্ত করল। নিশ্চিন্তে তিনি তাঁর কাব্য সাধন চালাতে লাগলেন। গোপনে কবি কলকাতার সঙ্গে যোগসূত্রও রাখলেন।

দেখতে দেখতে কালীপূজা এসে গেল। কলকাতার বন্ধুরা ধূমকেতুর দেওয়ালী সংখ্যা প্রকাশের সব ব্যবস্থা করলেন। কবি কুমিল্লার গোপন দুর্গ থেকে ঐ সংখ্যার জন্য আরেক চাঞ্চল্যকর কবিতা লিখে পাঠালেন। কবিতার নাম, 'ম্যায় ভূখা হুঁ।'

কবির ঐ কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ সরকার স্তম্ভিত। তাদের নীল চক্ষু আতঙ্কে লাল হল। আবার পুলিশকে নির্দেশ: যে করেই হোক নজরুলকে গ্রেপ্তার কর। নইলে সমূহ বিপদ!

ওদিকে কবি কুমিল্লার গোপন আস্তানায় আর কতদিন চুপ করে বসে থাকবেন? সারা দেশে তখন বিপ্লবের ঢেউ। কবি আবার কাঁধে হারমোনিয়াম নিলেন। মাথা ভরা ঝাঁকরা চুল। টানা টানা চোখের কোণে বিদ্রোহের আগুন। রাজপথে তিনি গান ধরলেন:

কাঁদিব না মোরা যাও কারা মাঝে
যাও তবে বীর-সঙ্গ হে
ঐ শৃঙ্খলেই করিবে মোদের
ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে।
মুক্তির লাগি, মিলনের লাগি'
আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ,
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা।
গাহিয়া তাদেরই বিজয় গান।
শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া
বীরের মুক্তি তরবারি—

আমরা তাদেরই ত্রিশ কোটি ভাই
গাহি বন্দনা গীত তারই ॥

সামনে কবি। পেছনে হাজার জনতার স্রোত। কবির কণ্ঠে তারাও কণ্ঠ মেলায়।

পথের দু'পাশে অজস্র দর্শক। বন্দেমাতরম আর কবি-বন্দনার ধ্বনিতে তারা ঐ জনস্রোতকে অভিনন্দিত করে। আবেগ-মুখর গায়ক কবির দিকে সবিস্ময়ে তাকায় আর গর্ব করে বলে : ঐ যে কবি, বিদ্রোহী কবি।

বিদ্রোহ কবির খোঁজে প্রায় একমাস ধরে পুলিশ সক্রিয় ছিল। কিন্তু সারা দেশের কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এবার সহজেই পুলিশ তাঁর সন্ধান পেল।

১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর। কুমিল্লার রাজপথে বিরাট মিছিল। সাদা পোষাকে কয়েক শ' পুলিশ পথের এপাশে ওপাশে। অদূরে গাড়ি বোঝাই বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। নজরুল মিছিলের আগে আগে। পেছনে হাজার জনতা। হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়ল পুলিশ, বিদ্রোহী কবিকে গ্রেপ্তার করা হল। শান্তিপূর্ণ মিছিলে বিক্ষোভ দেখা দিল। সারা সহর পুলিশ ঘিরে ফেলল। রাজদ্রোহী কবিকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি কলকাতার লালবাজারে পাঠানো হল। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ, বিচার, এবং এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ।

প্রমীলা-নজরুলের মধ্যে প্রেম-প্রণয় ভালবাসার যে খেলা চলছিল, কোনও পক্ষই প্রকাশ্যে এতদিন তা' প্রকাশ করেন নি। অনুভূতি আর আবেগের মধ্যে তাদের সেই ভাব চাপা ছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে নজরুলের বিখ্যাত বিজয়িনী গানখানি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যেন চমকে উঠলেন। শুধু বন্ধু-বান্ধব অথবা সতীর্থরাই নয়, প্রমীলা-পরিবারের লোকজনও 'হে মোর রানী! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে'-র মধ্যে প্রেম নিবেদনের

আকাঙ্ক্ষার সুর খুঁজে পেলেন। প্রমীলাও তখন লজ্জায় আনত, আনন্দে পুলকিত। কিন্তু সব বুঝেও কিছু না বোঝার ভাব প্রকাশ।

সেই থেকেই কবি আর কবি-মানসীর মনের বাগিচায় বসন্তের ফুল ফোটা শুরু করল। একে একে তার গন্ধ-রস সকলকেই সচকিত করল।

প্রেমের ভাব যখন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত তখন সেনগুপ্ত পরিবারের মধ্যে এক দোটানা ভাব দেখা দিল। পরিবারের কর্তা ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কোন রকমেই ঐ প্রেম-প্রণয়কে বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর কথা, তরুণ নজরুলের বহু গুণ আছে। সবই তাঁর ভাল। কিন্তু প্রমীলার সঙ্গে প্রেম-প্রণয়-ভালবাসা অথবা বিয়ে একেবারেই অসম্ভব। এ নিয়ে বাড়িতে অশান্তি দেখা দিল। তাঁর স্ত্রী বিজয়াসুন্দরী দেবী নজরুলকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। প্রমীলার সঙ্গে নজরুলের বিয়ের প্রশ্ন ওঠায় তিনি খুব একটা আশ্চর্য হননি কিন্তু স্বামীর নির্দ্দেশ বা সিদ্ধান্ত অমান্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তা'ছাড়া ধর্মের বন্ধন তো ছিলই।

কুমিল্লার কান্দিপাড়ার ঐ সেনগুপ্ত পরিবারের ভেতর কেমন যেন একটা অশান্তি আর অস্বস্তির ভাব দেখা দিল। গুমট সেই পরিবেশে প্রমীলার বিধবা মা গিরিবালা দেবী হাঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর মনেও দ্বিধা-সংশয়। মেয়েকে তিনি একজন ভিন্ন-ধর্মী তরুণের হাতে তুলে দেবেন কিনা।

গিরিবালা দেবী ছিলেন শক্ত মনের মহিলা। অবশেষে তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে উঠলেন। নজরুলের গুণ আর খ্যাতিই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। নজরুলের হাতে মেয়ে প্রমিলাকে তুলে দিতে তাঁর আর কোন সংশয় থাকল না। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে অটল। কিন্তু তাতে বিপদও কম ছিল না। স্বামীহীনা বিধবার সামনে তখন দুর্ভাবনা আর আশঙ্কার। অন্ধকার।

পরিবারে সকলে যখন ঐ প্রস্তাবের বিরোধী, তখন প্রমীলাকে নিয়ে আর এক সঙ্গে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তাতে যে অশান্তি আরও বাড়বে। অবশেষে একদিন তিনি মেয়ে নিয়ে কলকাতা চলে এলেন।

বিরজাসুন্দরী দেবীর মন কেমন যেন ভেঙে গেল। নজরুলের মত প্রমীলাও ছিল তাঁর নিজের সন্তানের মত। তিনি কুমিল্লা থেকে কলকাতা ছুটে এলেন। উদ্দেশ্য, গিরিবালা আর প্রমীলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তা' আর সম্ভব হ'ল না। গিরিবালা দেবী তাঁর পূর্ব-সিদ্ধান্তেই অটল রইলেন। প্রমীলাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রয়ে গেলেন।

মেয়ে পক্ষের মধ্যে বিয়ে নিয়ে যখন মন কষাকষি এবং মতান্তর, ছেলে পক্ষের ঐ ব্যাপারে কিছুটা অসুবিধা দেখা দিল। ছেলে পক্ষ অবশ্য আর কেউ নন, স্বয়ং নজরুল। তিনি নিজেই নিজের পাত্র এবং অভিভাবক। নজরুল চিরদিন ছিলেন বাঁধা-বন্ধন হারা। সমাজ-ধর্মের সংস্কার তাঁর কাছে কোনও সমস্যাই ছিল না। তিনি নিজেকে একজন মানুষ বলে মনে করতেন। ধর্ম হল সংস্কারের একটি পরিণতি মাত্র। তবুও যাকে নিয়ে তিনি ঘর বাঁধবেন, যিনি হবেন তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী, তাঁর মন যাচাই করে দেখতে চাইলেন। তা'ছাড়া তাঁদের বিয়ে নিয়ে প্রমীলাদের পরিবারের কোনও অশান্তি হোক্ এটাও তিনি চাইলেন না।

গিরিবালা দেবী নজরুলকে অভয় দিলেন। বললেন : সত্যিকারের ভালবাসা ধর্মের আবরণ দিয়ে আড়াল করা যায় না। মানবতার অর্থই পবিত্র ভালবাসা।

গিরিবালার উদারতায় নজরুল রুদ্ধবাক্। তিনি ভাবতেও পারেননি, তাঁর মন প্রাণ যে সংস্কার আর গোঁড়ামিরও অনেক উপরে। নজরুল তাই তাঁকে শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে প্রণাম জানালেন। গিরিবালা সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন নজরুলকে।

বিয়েতো হবে। কিন্তু কোন মতে? নজরুল-প্রমীলার বিয়ে নিয়ে আবার নতুন সঙ্কট। নতুন সমস্যা দেখা দিল।

প্রথম স্থির করা হল, রেজিস্ট্রি করে প্রমীলা-নজরুলের বিয়ে হবে। কিন্তু তাও তৎকালীন আইনের চোখে বেআইনী হয়ে দেখা দিল। ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ আক্টের তিন নম্বর ধারায় উল্লেখ করা ছিল, মেয়ের বয়স কমপক্ষে আঠেরো এবং অভিভাবক বা অভিভাবিকার অনুমতি থাকলে তবেই আইন মোতাবেক ঐ বিয়ে সম্ভব। তার কোনও ব্যতিক্রম মানেই বে-আইনী বিয়ে।

সব শুনে নজরুল মহাভাবনায় পড়লেন। তাঁর মাথায় চিন্তার আকাশ ভেঙে পড়ল। যেখানে ভালবাসা, সেখানেও নিয়মের বাঁধন আইনের কারচুপি! কবির বিদ্রোহী মন আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চায়। কোনও কোনও বন্ধু এবং দূর-আত্মীয় পরামর্শ দেন, প্রমীলাকে বিয়ে করার যদি সত্যসত্যই সাধ হয়, তবে তাকে ধর্মান্তরিত করে নাও। তারপর সামাজিক মতে তাকে বিয়ে করো—তাতে আর কোনও বাধা নেই।

তরুণ কবির মন সে পরামর্শ মানল না। তার মধ্যেও তিনি গোঁড়ামির গন্ধ খুঁজে পেলেন। তাদের পরামর্শ খারিজ করে দিয়ে কবি বললেন, তিনি কোনও ধর্মের সংস্কার মানবেন না। ধর্মের চেয়েও তাঁর কাছে মানুষ অনেক বড়। মানুষের জন্যই ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়।

নজরুল-প্রমীলার প্রণয়-প্রেমের খবরে চারদিক আবার মুখর হল। সমাজের কর্তা ব্যক্তিরা অনেকেই নজরুল সম্বন্ধে নানা অপপ্রচার শুরু করলেন। নানাভাবে তাঁর উপর আঘাতও শুরু হল। কিন্তু নজরুল তাতে একটুও দমলেন না। সমালোচকদের নিন্দা উপেক্ষা করেই তিনি স্থির করলেন, প্রমীলাকে সাধারণ ভাবেই বিয়ে করবেন।

১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল। কলকাতা ৬, হাজি লেনের বাড়ি।

কবির বন্ধুবান্ধব অনেকেই সেখানে উপস্থিত। কবির মুখে আনন্দের হাসি। প্রমীলার চোখে মুখেও লজ্জা আর খুশির আমেজ। রাত-ভর আনন্দ হল। গান আবৃত্তির মধ্য দিয়ে বিয়ে বাড়ি জমজমাট। হাসি ঠাট্টা, আনন্দ-উল্লাসে সকলে যখন মত্ত, সেই চরম মুহূর্তে প্রমীলা-নজরুলের অতি আপনজন বিরজাসুন্দরী দেবী তখন কুমিল্লার কান্দিরপারে। তাঁর স্বামীর অমতে ঐ বিয়ে। সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও তাঁর পক্ষে আর বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। গিরিবালা দেবী তাঁর মেয়ে প্রমীলাকে নিয়ে অনেক আগেই তো কলকাতা চলে এসেছিলেন।

নজরুলের মনেও যে সেই আনন্দময় মুহূর্তে বেদনার সুর বাজেনি, তা' নয়। কেননা, বিরজাসুন্দরী যে তাঁকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসতেন, স্নেহ করতেন। নজরুল তাই পরবর্তীকালে এক অনবদ্য কবিতা রচনা করে তাঁর মা' বিরজাসুন্দরী দেবীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন :

সর্বসহা সর্বহারা জননী আমার!
তুমি কোন দিন কারো করোনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা বারিধির
কূলে বসে কাঁদো মৌন কন্যা ধরণীর
একাকিনী!

দূর দূরান্তর হতে আসে ছেলে মেয়ে,
ভুলে যায় খেলা তারা তব মুখ চেয়ে!
বলে, 'তুমি মা হবে আমার?' ভেবে কি যে!
তুমি বুকে চেপে ধর, চক্ষু ওঠে ভিজে
জননীর করুণায়।

* * *

হয়তো ভুলেছ মাগো, কোন একদিন

এমনি চলিতে পথে মরু বেদুইন
শিশু এক এসেছিল। শ্রান্ত কণ্ঠে তার
বলেছিল গলা ধরে 'মা হবে আমার'?
হয়তো আসিয়াছিল, যদি পড়ে মনে
অথবা সে আসে নাই, না এলে স্মরণে।
যে দুরন্ত গেছে চলে আসিবে না আর,
হয়তো তোমার বুকে গোরস্থান তার
জাগিতেছে আজো মৌন, অথবা সে নেই।
এমনত কত পাই—কত সে হারাই।…

নববধূ প্রমীলা বাসর ঘরে যখন অনেক মানুষের ভীড়ে তার শৈশবের সাথী কৈশোরের বান্ধবী বোন কমলাকে দেখতে পান না, তখন তাঁর বুকেও কেমন যেন একটা চাপা কান্না গুমরে ওঠে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি বার বার তার মনে পড়ে আর বাড়ির লোকদের জন্য বেদনায় তাঁর চোখের পাতা ভিজে আসে। মাথা ভরতি ঝাঁকড়া চুল,টানাটানা চোখে তরুণ নজরুল যেদিন আলি আকবরের সঙ্গে তাদের বাড়িতে প্রথম এসেছিল, সেদিন কী একবারও প্রমীলা এই মিলন-মেলার কথা কল্পনা করতে পেরেছিলেন। বরং দুদিন যেতে না যেতেই ছোট বোন কমলা, কাজীদাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করত, কল্পনার রঙে অবিশ্বাস্য ছবি আঁকত, আর প্রমীলা লজ্জা, ভয় এবং এক অজানা আনন্দে কেমন যেন তন্ময় হয়ে পড়তেন। মাত্র চারটি বছর। দেখতে দেখতে তার নিজের জীবনের ষোল বসন্ত কবে পার হয়ে গেল, কেমন করে হাসি আনন্দ-গান আর মান-অভিমানের মধ্য দিয়ে দিনগুলো উধাও হয়ে গেল। এল দিন, মালাবদলের, হৃদয় বিনিময়ের পরম লগ্ন।

প্রমীলার জীবনে যে নতুন ফুল ফুটল, তার পেছনকার ইতিহাস সবই একটার পর একটা তার সামনে মুখর হয়ে ওঠে। ঘটনার পর ঘটনা। কখনও রাজনৈতিক ঝড়, শোভাযাত্রা মিছিল সভা আর স্বদেশী গান। কখনও আবার রোমাঞ্চকর প্রেম প্রীতি আর প্রণয়ের

গোপন অভিসার। বিয়ের বাসরে বসে হাজার স্মৃতি রোমন্থনের সঙ্গে দৌলতপুরের সেই বর্ষনমুখর সন্ধ্যার আরেক বিয়ে বাড়ির স্মৃতিও প্রমীলার মনকে কেমন যেন নাড়া দেয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র তের হলেও, সবকিছু বুঝবার মত পরিণত মন ছিল।

যাঁকে স্বামীরূপে পেয়ে প্রমীলা বিয়ের বাসরে গর্বিতা, একদিন তাঁকে পেয়ে আরেক তরুণীও-তো এমনি করেই গর্ব অনুভব করে ছিল। সরল সহজ নার্গিস সেদিন যদি মামা আলি আকবর সাহেবের কপটতার শিকার না হতেন, তা হলে কবি নজরুলকে আর প্রমীলা আপন জীবনে দেবতারূপে পেতেন না। নানা ভাব আর ভাবনা নিমেষেই কেমন যেন তাকে উন্মনা করে তোলে। নার্গিস নজরুল··· আরও কত স্মৃতি।

নববধু প্রমীলা বাসর ঘরে বসে অতীতের স্মৃতি-সমুদ্রে ভাসছেন। নজরুল তখন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের আদর আপ্যায়নে ব্যস্ত। বিগত দিনের ইতিহাসকে স্মরণ করার মত অবকাশ কোথায় পাবেন তরুণ কবি। মনের মণি-কোঠায় মাত্র চার বছর আগে যে নার্গিস ফুলের গন্ধে সুরভিত, আমোদিত করে তুলেছিল, আনন্দের আতিশয্যে তা যেন কোথায় উবে গেছে। কবি আজ নিরুদ্বেগ হাসি উজ্জ্বল জীবন্ত তারুণ্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

ঘটনাস্থল কলকাতা। বর্তমান রাজাবাজারের কাছাকাছি এণ্টনী বাগানের এক বাড়ি। তার তারিখ সাল ঠিক মনে পড়ছে না। ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলাম, কবি বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

নজরুল তখন খ্যাতির শিখরে। কবির গান তখন সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। গ্রামাফোন কোম্পানিগুলি নজরুল-গীতির রেকর্ড করে বাজার সরগরম করে ফেলেছে। এমনি এক দুপুরের কথা।

গ্রামোফোন কোম্পানির কাজ শেষ করে নজরুল সবে এন্টনি বাগানের এক বাড়িতে ফিরেছেন। রোদ-পোড়া দুপুরে ক্লান্ত কবি ঘরে ঢুকবেন। কিন্তু তার আগে খোলা-জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন একটি তক্তপোষের ওপর বসে আলি আকবর খাঁন। একটু গম্ভীর। আর তাঁর পায়ের কাছে মেঝেয় বসে নার্গিস। চোখ ভরা জল। দু'হাতে তিনি আকবর সাহেবের পা জোড়া ধরে রেখেছেন। কারোর মুখে কোনও ভাষা নেই।

হঠাৎ ভূমিকম্প, অথবা ঝড়। কিম্বা তার চেয়েও বেশি আরও কিছু। ক্লান্ত কবির সব ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা চঞ্চল-অধীর হয়ে উঠল। সারা দেহ কেমন যেন ক্ষোভ আর ক্রোধের জ্বালায় কেঁপে উঠল। কবির মাথায় খুন চাপল।

একটু দাঁড়ালেন। স্তব্ধ কবি চীৎকার করে কী যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। তাঁর ভেতরের সমস্ত ক্ষোভ আগুন হয়ে ফেটে পড়তে চাইল। দু চোখে তখন আগুনের ফুলকি। বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহী মনে উত্তেজনার ঝড় উঠল। তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠের ধিক্কার: বেইমান, লম্পট।

কবি আর ঘরে ঢুকলেন না। আহত সিংহের মত তীব্র উত্তেজনা নিয়ে আবার পথে নামলেন।

কদিন পরের কথা। আলি আকবরের দুর্বল মন বুঝতে পারল নার্গিসকে তাঁর সঙ্গে একলা ঘরে দেখতে পেয়ে নজরুল ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ। তাই তিনি ছুটে গেলেন কবিবন্ধু পবিত্রবাবুর কাছে। খুলে সব কথা বললেন। তারপর আলি আকবরের আকুতি: কবির ভুল ভাঙিয়ে যে করেই হোক নার্গিসের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করুন।

পবিত্রবাবু ছিলেন নজরুলের বন্ধু সুহৃদ এবং একজন উপদেষ্টাও। কবি তাঁকে খুব শ্রদ্ধাও করতেন। পবিত্রবাবু নার্গিস-আলি আকবরের পূর্বকাহিনী কবির মুখে তো আগেই শুনেছিলেন। তাই প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তারপর নার্গিস-নজরুলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ

করানোর জন্য উদ্যোগী হলেন। কিন্তু নজরুলের চরিত্র এবং জেদের কথাটাও তাঁর জানা ছিল। তবুও তিনি সুকৌশলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মোলাকাত ঘটানোর জন্য উদ্যোগী হলেন।

কলকাতায় মেট্রো সিনেমায় তখন একটা ভাল বিদেশী ছবি চলছিল। ঐ ছবি দেখবার জন্য তিনি দিন কয়েক আগে আগ্রহও প্রকাশ করেছিলেন। পবিত্রবাবু তাই নিজে থেকে একদিন সিনেমার দু'খানা টিকেট কাটলেন। তারপর কবির কাছে গিয়ে বললেন, তিনিও ঐ ছায়াছবিটি দেখবেন। বলেই একটি টিকিট নিজে রেখে আরেকটি টিকিট নজরুলকে দিলেন। কথা হলে সিনেমা হল গিয়ে দু'জনের দেখা হবে। পাশাপাশি আসন। সুতরাং দুই বন্ধু একসঙ্গে বসে বিদেশী ছবির বিষয়ে বেশ আলোচনা করতে পারবেন।

নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে নজরুল গিয়ে ঐ সিনেমা হলে ঢুকলেন। আধা-অন্ধকার হলের নির্দিষ্ট আসন খুঁজে বসতে গিয়েই দেখেন তাঁর পাশের আসনে নার্গিস বসে আছেন। দেখেই নজরুলের অন্য মূর্তি। নার্গিস উঠে দাঁড়ালেন। হয়তো কিছু বলতেও চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। তার আগেই নজরুল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হলের বাইরে চলে গেলেন। কবির আগমন এবং প্রত্যাবর্তন এমন নাটকীয় ভাবে ঘটল যে আশেপাশের আসনের কোন দর্শকই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে নার্গিসও হল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু নজরুল তখন অন্য কোথা, অন্য কোনখানে বসে হয়তো পবিত্রবাবুর ঘটকালির ঐ সুপরিকল্পিত পন্থার জন্য ক্ষোভ এবং বিস্ময় প্রকাশ করছিলেন। বলাবাহুল্য, ঐ ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ নজরুল আর পবিত্রবাবুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করেননি। পবিত্রবাবুর ধারণা, নার্গিসের ব্যবহারে কবির সরল মনে এমন একটা ক্ষোভ জমা হয়েছিল, পরবর্তীকালে কখনও তিনি তা ভুলতে পারেননি। বরং কেউ ঐ ক্ষোভের জ্বালা দূর করতে উদ্যোগী হলে তিনি তাতে আরও বেশি ক্ষুব্ধ হবেন।

কবি নজরুল চিরদিনই ছিলেন সরল-সহজ। ভাবুক কবি

সামান্য ভালবাসা পেলেই আবেগে অধীর হতেন। তাঁরই এই দুর্বলতার জন্য জীবনে তাঁকে কম ঝামেলা পোহাতে হয়নি। আলি আকবর খাঁন হয়তো কবির এই দুর্বলতাটা বেশ ভালভাবেই ধরতে পেরেছিলেন। তাই তাঁকে কুমিল্লায় নিজের বাসভবনে নিয়ে কবিকে হাতের মুঠোয় রেখে আপন অভিলাষ আর স্বার্থ পুরণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সরল সহজ কবির সাদা-মাঠা মনে যখন আলি আকবরের কপটতা ধরা পড়ল, তখন তিনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি রুষ্ট হলেন। অন্য নানা প্রসঙ্গ ছাড়াও আলি আকবর এবং নার্গিসের ভালবাসা আর প্রেমের অভিনয় কবির জীবনে যে কলঙ্ক ও বেদনাময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল, কবি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তা ভুলতে পারেননি।

ঐ প্রসঙ্গে মুজফফর সাহেবও লিখেছেন: আমার এই ধারণা হয়েছে যে, আগে হতেই ভাগিনেয়ীর কথা খান সাহেব ভেবেছিলেন। এবং তা ভেবেছিলেন বলেই তিনি নজরুল ইসলামকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন…ভাগিনেয়ী যে নজরুলের প্রেমে পড়লেন এবং নব নামকরণে সৈয়দা খাতুন যে নার্গিস হলেন, এসবই খান সাহেবের পরিকল্পনা মাফিক হয়েছিল। নজরুল প্রায় পুরোপুরি খানসাহেবের হাতের মুঠোয় এসে যাচ্ছিল। বিয়ের পরে খানসাহেবের প্ল্যান অনুসারে নজরুলকে সংসার পাততে হ'ত কলকাতা হতে দূরে অর্থাৎ ঢাকায়। নজরুলের তো হাতে পয়সা ছিল না। তাঁকে পুরোপুরিই আলি আকবর খানের উপর নির্ভর করতে হত। তাঁর প্ল্যান দ্রুত সফল হতে যাচ্ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তা ভণ্ডুল হয়ে গেল। নজরুল বিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল কুমিল্লায়। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েও আমার মতে অনেক কম খেসারৎ দিয়েই নজরুল নিষ্কৃতি পেয়ে গেল।…

নার্গিস নজরুলকে তার ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছিল, আর মামার শিক্ষা মতো নার্গিস করেছিলেন ভালবাসার অভিনয়।

ঘটনাচক্রে নজরুলের সঙ্গে নার্গিসের শেষ অবধি আর বিয়ে হয়নি। ভালবাসার গোলাপের মধ্যে যে ঘৃণ্যতর কীট লুকিয়েছিল,

তরুণ কবির সরল মন প্রথমে তা বুঝতে পারেনি। তাই দৌলতপুরের তরুণীর জন্য তিনি মন প্রাণ উজাড় করে দিয়েছিলেন। প্রথম প্রেমের ফুল ফুটাতে কবির আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। তিনি যেমন রাত জেগে বাঁশির সুর তুলে নার্গিসের চোখের ঘুম কেড়ে নিতেন, তেমনি দিনের আলোয় নিরালা নিভৃতে বসে আবৃত্তি আর গানে প্রথমা প্রেয়সীর মন ভরাতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আলি আকবরের লোলুপ দৃষ্টি তাঁদের প্রেমের পবিত্রতাকেও স্পর্শ করে। এবং তার পরিণতিতে নজরুল-নার্গিসের মধ্যে শুরু হয় ভুল বুঝাবুঝি আর গড়ে ওঠে অবিশ্বাসের পাঁচিল।

কিন্তু তা হলেও নজরুল কি তাঁর প্রথম প্রেমের নায়িকাকে ভুলতে পেরেছিলেন? বোধ হয় না। বাহ্যত তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলেও কবির মনের মণিকোঠায় নার্গিসের জন্য কেমন যেন একটা দুর্বলতা ছিল। সে দুর্বলতা ভালবাসার।

প্রথম প্রেমের ফুলে কীট ছিল জেনেও কবির মন হয়তো ফুলকে ভুলতে পারেননি। নার্গিসও পারেননি তার প্রিয় কবি এবং প্রথম জীবন-দেবতাকে ভুলে যেতে। পরবর্তীকালে কবি নজরুলের একখানি চিঠি থেকেই নজরুল—নার্গিসের সেই ভালবাসার গোপন অনুভূতির সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

নজরুল—নার্গিসের বিয়ে ভেঙে যায় ১৯২১ সালে। আর তারও প্রায় ষোল বছর পর, ১৯৩৭ সালের ১ জুলাই, কবি নজরুল নার্গিসকে যে চিঠিখানি লেখেন তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। ১০৬ নং আপার সার্কুলার রোডের তদানীনতন একটি গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সেল রুমে বসে কবি নার্গিসকে লেখেন:

কল্যাণীয়াসু!

তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নব বর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগন সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল। তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব

মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বানী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের যুগে, রেবানদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্তস্রোত। যাক্, তোমার অনুযোগের উত্তর দিই।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখে শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা করে থাকো, তা হলে আমায় ভুল বুঝবে—আর তা মিথ্যা।

তোমার উপর আমি কোন 'জিঘাংসা' পোষণ করিনা—এ আমি অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কী গভীর ক্ষত, কী অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি। তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এ-আগুনে পরশ মাণিক না দিলে আমি অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না—আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ-রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথম দেখেছিলাম, সে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত মন্দারের মত চির-অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তুমি ভুলে যেও না, আমি কবি—আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর, কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের, কাপুরুষের আঘাতের মত নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন, (তুমি কি জানো বা শুনেছ, জানি না) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবিও নেই।

আমি কখনও কোন 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। 'আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে, তার 'সেতু' কোন

লোক তো নয়ই, স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমায় বিশ্বাস করো, আমি সেই 'ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। সকলে পত্রের উত্তর দিতাম না। তোমার ওপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই, কোন অধিকারও নেই—আবার বলছি। আমি যদিও গ্রামোফোনের ট্রেডমার্ক 'কুকুরের' সেবা করছি, তবুও কোন কুকুর লেলিয়ে দিই'ন। তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমায় কামড়েছিল, আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি—তাদের প্রতি আঘাত করিনি।

সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমায় কত ভালবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা তাদের ক্ষমা করেছিল, নৈলে তাদের চিহ্নও থাকত না এ-পৃথিবীতে। তুমি আমায় জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাওনি। তাই একথা লিখেছ।

যাক্ তুমিও রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন্ অধিকারে তোমায় বারণ করব—বা আশা দেব? নিষ্ঠুরা নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন।

তোমার আজিকার রূপ কি, জানি না। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে, যাকে দেবীমূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম, অতন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ-বেদীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদীপীঠ।... জীবনভরে সেখানেই চলছে আমার পূজা-আরতি। আজকাল তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ। তাই তাকে পেতে চাইনে। জানিনে, হয়তো সে রূপ দেখে বঞ্চিত হব, অধিকতর বেদনা পাব, তাই তাকে অস্বীকার করেই চলেছি।

দেখা? না-ই বা হল এই ধূলির ধরায়। প্রেমের ফুল এই ধূলিতে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ, হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমায়

ভালবাস, আমাকে চাও, ওখানে থেকেই আমাকে পাবে। লায়লী মজনুঁকে পায়নি, শিরিঁ ফরহাদকে পায়নি, তবুও তাদের মত করে কেউ কারো প্রিয়তমাকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও সত্য। আত্মা অবিনেশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাক, তা, হলে তোমার মত ভাগ্যবতী কে আছে? তারই মায়া-স্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। দুঃখ নিয়ে একঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না। মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুলরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোন ভুল করে থাক জীবনে, এই জীবনেই তার-সংশোধন করে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ মুক্তি; তবে হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা কর, স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবুও চলে গেছি এই সংসারের বাধাকে অতিক্রম করে উর্দ্ধলোকে—সেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অসম্পূর্ণতা, সকল অপরাধ ক্ষমা সুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা দেয়।…

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দুটি কর তোমার শুভ্র সুন্দর ললাট স্পর্শ করতে পেরেছিল; তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি দেখেছিলে? আমার চোখে জল ছিল, হাতে সেবা করবার আকুল স্পৃহা অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কালকের কথা। মহাকাল সে স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না। কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল, সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।

যাক্—আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে ভাটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করো না।

তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক্। যেখানেই থাকি, বিশ্বাস করো, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাওত এই প্রার্থনা। আমায় যত মন্দ বলে বিশ্বাস কর, আমি তত মন্দ নই—আমার এই শেষ কৈফিয়ৎ।…

নার্গিসের প্রতি নজরুলের প্রেম যে কত গভীর ছিল, কবির এ চিঠির ভাষায় তার প্রমাণ মেলে। তার সঙ্গে ধরা পড়ে কবির খেদ আর ক্ষোভের সুর। নার্গিসের মধ্যে 'কল্যাণ রূপ' দেখে যে কবি তাকে জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেই কবিই আবার তাকে লিখেছিলেন, 'তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ।' লিখেছিলেন…মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুলরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারত। যদি কোন ভুল করে থাকো জীবনে, এই জীবনেই তার সংশোধন করে যেতে হবে। তবেই পাবে আনন্দ মুক্তি। তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান।…

নার্গিসকে লেখা এ চিঠিখানি শেষ করার পর তার নীচে বিশেষ দ্রষ্টব্য দিয়ে কবি আবার লিখেছিলেন : আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা পুস্তকের কবিতাগুলি পড়েছ ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোন পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিল।

নজরুলের ঐ 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' লেখার পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের বিচ্ছেদ ঘটার পর উভয় পক্ষেই ভুল বুঝাবুঝির মাত্রা বেড়ে যায়। নজরুল ততদিন বাংলাসহিত্যের খ্যাতির চূড়ায়। ঐ সময় নর্গিস কোনও এক রচনায় নজরুল সম্বন্ধে বেশ কিছু বক্রোক্তি প্রকাশ করেন। কবির মন তাঁতে আরও ক্ষুব্ধ হয়। সওগাত পত্রিকা অফিসে বসে তিনি নার্গিসের উক্তির জবাবে একটি কবিতা লেখেন। করিতার নাম 'হিংসাতুর'। ১৯২৮ সালের ২৯ মার্চ লেখা কবির ঐ হিসাতুর কবিতাখনি মাত্র দু'মাস পরে সওগাত পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিতও হয় এবং পরে কবির বিখ্যাত কবিতা গ্রন্থ 'চক্রবাকে' তা স্থান পায়। 'হিংসাতুর' কবিতাখানির ভাব-ভাষায় কবির যে মনোভাব আর আবেগ প্রকাশ পায়, নার্গিসকে

লেখা পত্রের সঙ্গে তার হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কবির 'হিংসাতুর' কবিতাখানি যেন কবির পত্রখানিরই কাব্যরূপ। হিংসাতুর কবিতায় কবি লিখেছিলেন :

…হিংসাই শুধু দেখেছ এ চোখে
দেখ নাই আর কিছু?
সম্মুখে শুধু রহিলে তাকায়ে,
চেয়ে দেখিলে না পিছু?
ব্যথা যে দিয়েছ, সম্মুখে ভাসে
নিষ্ঠুর তার কায়া,
দেখিলেনা তব পশ্চাতে তারি
অশ্রু-কাতর ছায়া?
অপরাধ শুধু মনে আছে তার,
মনে নাই কিছু আর?
মনে নাই তুমি, দলেছ দুপায়ে
কবে কার ফুল হার?
কাঁদিয়ে কাঁদায়ে সে রচেছে তাঁর
অশ্রুর গড়খাই,
পার হতে তুমি পারিলে না তাহা,
সে-ই অপরাধী তাই?
সেই ভাল তুমি চির সুখী হও,
একা সে-ই অপরাধী।
কি হবে জানিয়া কেন পথে পথে
মরুচারী ফেরে কাঁদি?…

নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের ভুল বোঝাবুঝির জন্য দায়ী ছিল আলি আকবরের কপট বুদ্ধি আর লোলুপ দৃষ্টি। নজরুলের কাঁধে বন্দুক

রেখে তিনি যুদ্ধ চালাতে চেয়েছিলেন। তাই নজরুলের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে আলি আকবর আরও বেশী তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর লোলুপ দৃষ্টি আরও বেশি করে প্রসারিত করেছিলেন। অসহায় নার্গিসও তার শিকার না হয়ে পারেননি। মামা আলি আকবর যেমন নর্গিসদের পরিবারের দায়-দায়িত্ব পালন করতেন, তেমনি তাঁর জন্যেই যে বাংলার এক খ্যাতিমান কবির স্ত্রী হতে চলেছেন সে কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁকে বেশ দুর্বল করে ফেলেছিল। ঐ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই আলি আকবর সুকৌশলে নিজের সাধ সাধনা পূর্ণ করতে সক্রিয় ছিলেন। তাই নার্গিসেব প্রেম ছিল দ্বিধা বিভক্ত। দেহ ও মনের গতি ছিল দ্বিমুখী।

কবি নজরুল ছিলেন দারুণ আবেগপ্রবণ। তাঁর সতর্ক দৃষ্টিতে যখন বন্ধুরূপী আলি আকবরের আসল রূপটা ধরা পড়ল, তখন তিনি বেপরোয়া হলেন। ক্ষুব্ধ কবির তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখেই আকবর সাহেব উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হলেন। বুঝতে পারলেন, নজরুল তাঁর গোপন অভিলাষ ধরে ফেলেছেন এবং নার্গিসের প্রতিও তাঁর ঘৃণা দানা বেঁধেছে। আকবর তখন কিছুটা অসহায় ও বিপন্ন বোধ করলেন। তবুও চেষ্টা কবলেন, যে করেই হোক নজরুলকে প্রভাবিত করে তাঁর সঙ্গে নার্গিসের বিয়ে দেবেনই। কিন্তু তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। আলি আকবর খানের ব্যবহারে তাঁর উপর কবির যে ঘৃণা জমাট বেঁধেছিল তা পরববর্তীকালেও আর কবির মন থেকে মুছে যায় নি। ঐ ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালে আলি আকবর একদিন লোভ দেখিয়ে নজরুলের মন গলাতে চেয়েছিলেন। নানা কথার ফাঁকে একদিন সুযোগ বুঝে আলি আকবর কবিকে এক তাড়া নোট দেখিয়ে সেই ইঙ্গিতই করেছিলেন। কিন্তু কবি নজরুল তাঁর সব প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে শুধু প্রত্যাখ্যান করেননি, আকবরের সঙ্গে কোন কথা না বলেই তাঁর কাছ থেকে উঠে যান। ঐ প্রসঙ্গে পরে কবি নজরুল শ্রীমতি বিরজাসুন্দরী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন : মা, আলি আকবর খান আমাকে নোটের তাড়া দেখিয়ে গেল।

এ বিষয়ে কবিবন্ধু মুজফফর আহমেদের ভাষ্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন ঃ···আগষ্ট মাস, না সেপ্টেম্বর মাস (১৯২১) ঠিক মনে নেই। খুব সম্ভবতঃ সেপ্টেম্বর মাসেই হবে। একদিন সন্ধ্যায় আলি আকবর খান আমাদের এই বাড়িতে আসেন। নজরুল আর আমি বাড়িতেই ছিলাম। আরও দু'একজন কে কে উপস্থিত ছিলেন সেখানে। নজরুলের স্বভাব ছিল যে নতুন কেউ এলে চেঁচিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে সে তাঁকে গ্রহণ করত। পাশের ঘরের লোকও বুঝতে পারতেন যে নজরুলের নিকট বুঝি কেউ এলেন। সেদিন আলি আকবর খানের আসাতে নজরুল কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ তো করলেই না, একবার বসতেও বলল না তাঁকে। শক্ত হয়ে চুপচাপ করে বসে থাকল সে।··কেউ যদি সেই সন্ধ্যায় আমাদের তালতলা মেসের বাসায় উপস্থিত থাকতেন, তবে বুঝতে পারতেন, কী চীজ এই আলি আকবর খাঁন। যাক খান সাহেব নিজেই নজরুলের পাশে তক্তপোশের ওপরে বসলেন। তার হাতে বেশ পুরু এক তাড়া দশটাকার নোট ছিল। খুব নীচু আওয়াজে কথা বলছিলেন তিনি। আর নোটের তাড়াটি নাড়ছিলেন চাড়ছিলেন। অকারণে নাড়াচাড়ার মত দেখালেও, আসলে ভাবখানা ছিল যে এই নোটের তাড়াটি তোমারই জন্যে।

সেই সন্ধ্যায় আলি আকবর খান এসেছিলেন একটা সমঝোতার জন্যে। তিনি বলতে এসেছিলেন, যা ঘটে গেছে তার সব কিছু ভুলে যাক নজরুল। আবার সে ফিরে চলুক এবং গ্রহণ করুক তাঁর ভাগিনেয়ীকে। তখন নজরুল যদি প্রস্তাব করত যে দৌলতপুরের গ্রামে সে আর ফিরে যাবে না, নার্গিসকে কলকাতায় নিয়ে এসে সব কিছু ব্যবস্থা করা হোক, তাতেই খান সাহেব খুশি হয়ে রাজী হতেন এবং টাকাও খরচ করতেন। তিনি লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নজরুলকে পেছন হতে ছুরি মেরেছিলেন এবং তাঁর ভাগিনেয়ীও তাতে সহায়িকা ছিলেন। নজরুলের মন ভেঙে এমন ভাবে দু'টুকরো হয়ে গিয়েছিল যে, তাতে জোড়া লাগানোর কোন সম্ভবনা আর ছিল না।···

আলি আকবর খান কিছুতেই নজরুলের মন টলাতে পারেননি। তাই খুব নিরাশ হয়েই সেদিন তিনি ফিরে গেলেন।

নজরুল নার্গিসকে যতখানি ঘৃণা করতেন, তার চেয়েও অনেকগুণ বেশি ঘৃণা করতেন আলি আকবরকে। নার্গিসকে কবি সত্যসত্যই অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলেন। সেই ভালবাসায় কোনও রকম খাদ ছিল না। এবং খাদ ছিল না বলেই মামা আলি আকবরের প্রতি নার্গিসের দুর্বলতা ধরা পড়তে কবি দারুণ ভাবে ব্যথিত হন। তাঁর প্রথম প্রেমের কদমফুলের মধ্যে বিষাক্ত কীটের সন্ধান পেয়ে তিনি আঁতকে ওঠেন।

তারও অনেকদিন পরের ঘটনা। ততদিনে কবির সঙ্গে প্রমীলার বিয়ে হয়ে গেছে। কবির গান আর সুর তখন দেশের সাধরণ মানুষের অতি প্রিয়। ঘরে ঘরে কবির নাম।

কবি একদিন একটি চিঠি পেলেন। চিঠির লেখিকা কবির প্রথম প্রেমিকা নার্গিস বেগম। পত্রখানি নিয়ে কবি আপার চীৎপুব রোডের এক গ্রামাফোন কোম্পানির রিহার্সেল রুমে বসে। এমন সময় কবির বাল্যবন্ধু এবং সতীর্থ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেখানে হাজির হলেন। তিনি দেখেন কবি কেমন যেন একটু গম্ভীর এবং আনমনা, উত্তেজিতও। শৈলজানন্দ নজরুলের কাছে যেতেই তিনি নার্গিসের লেখা পত্রখানি বন্ধুকে দেখতে দেন। তারপর আরও গম্ভীর হন।

শৈলজানন্দ নার্গিসের সঙ্গে নজরুলেব পূর্বাপর সম্পর্ক এবং আলি আকবর খানের কুকীর্তির কথা সবই জানতেন। তাই পত্রখানি পড়ে তিনি এক আশ্চর্য জিজ্ঞাসা নিয়ে কবি বন্ধুর দিকে তাকালেন। কবি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। বন্ধুর দিকে তিনি আর তাকাবারও ফুরসৎ পেলেন না। কালি-কলম নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটি কবিতা লিখে ফেললেন, এবং তা শৈলজানন্দকে পড়তে দিলেন। বললেন: উহুঁ, ঐ চিঠি প্রসঙ্গে তোমার কাছ থেকে আর কোনও মন্তব্য শুনতে চাইনা। এই কবিতাখানি পড়। এর মধ্যেই আমি নার্গিসের চিঠির স্পষ্ট উত্তর দিয়ে রেখেছি।

শৈলজানন্দ নজরুলের হাত থেকে কবিতাখানি নিয়ে আপন মনে পড়ে চললেন। কিন্তু এটা কবিতা, না গান ? শৈলজানন্দ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কবিবন্ধুর দিকে।

কবিও এবার চোখ তুললেন। বললেন : কী হে, কবিতাখানি পড়লে ?

শৈলজানন্দ মাথা নাড়লেন। তিনি নিজেও তখন কবিতা লিখতেন। শৈলজানন্দ আবার স্পষ্ট করে সুর তুলে কবিতা খানির আবৃত্তি শুরু করলেন :

যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখ তারে।
ভুলে যাও তারে, ভুলে যাও একেবারে ॥

আমি গান গাহি আপনার দুখে,
তুমি কেন আসি দাঁড়াও সুমুখে,
আলেয়ার মত ডাকিও না আর নিশীথ অন্ধকারে ॥

দয়া কর, আর আমারে লইয়া
খেল না নিঠুর খেলা।
শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই
শুভ লগনের বেলা ॥

আমি ফিরি পথে তাহে কার ক্ষতি
তব চোখে কেন সজল মিনতি
আমি কি ভুলেও কোনদিন এসে
দাঁড়িয়েছি তব দ্বারে ?
ভুলে যাও মোরে, ভুলে যাও একেবারে !

কবিতা আবৃত্তি শেষ করে শৈলজানন্দ কবির দিকে তাকালেন।

কবি ততক্ষনে কিছুটা স্বাভাবিক। বললেন: কবিতা নয়, গান। গানের সুরও করে ফেলেছি। গুণগুনিয়ে নজরুল এবার স্বরচিত গানের সুর তুললেন। তারপর হারমনিয়মটা কাছে টেনে নিলেন। সুর উঠল: শত কাঁদিলেও ফিরিবে না সেই শুভ লগনের বেলা— ইত্যাদি। সেই বিরহ-বেদনার গান!

মুহূর্তেই যেন দৌলতপুরের সব স্মৃতি আবার জেগে উঠল। বাসর ঘর, ঘর ভর্তি অতিথি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। লাজুক বধুর মত সেজেগুজে বসে নার্গিস—প্রথম প্রেমের ফুল। তারই পাশে হাসি খুশি এক কিশোরী—নাম প্রমীলা সেনগুপ্ত। সকলের সঙ্গে সেও বর পক্ষের অতিথি। তারপর···

না, আর কিছু মনে করতে পারেন না নজরুল। হারমনিয়ম এবার থেমে যায়। কবির কণ্ঠও রুদ্ধ। নিথর কবি আবার কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেন। শৈলজানন্দ তো সবই জানতেন। তিনি বুঝতে পারেন, কবির ঐ যন্ত্রণার কারণ। দু'জনেই উঠে দাঁড়ান। তারপর বেরিয়ে পড়েন পথে। শৈলজানন্দ অন্য প্রসঙ্গের বেশ টানেন। কিন্তু পারেন না। কবির মনে তখনও ঝড়—দৌলতপুর আলি আকবর— নার্গিস! আর···

ঐ প্রসঙ্গে কবি-বন্ধু মুজফফর আহমেদ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন: ···নজরুল ইসলাম নার্গিসকে একান্তভাবে ভালবেসেছিল। কোনো খাদ ছিল না সে ভালবাসায়। আর, নার্গিস প্রথমে ভালবাসার অভিনয় করেছিলেন, পরে সেই অভিনয়ের পর্দাও তুলে দিয়ে নিজের যে মূর্ত্তি তিনি দেখিয়েছিলেন, আশাহত নজরুল তার সামনে আর তিষ্ঠতে পারেনি। ১৯২১ সালের ৬ জুলাই তারিখের রাত্রে এই কথাই নজরুল আমায় বলেছিল। পনের বছর পরে যে পত্র নার্গিসকে সে লিখেছিল, তারও মানে এই-ই দাঁড়ায়। নার্গিস নজরুলকে বিদায় করেছিলেন। যদিও তাঁর মামার পরিকল্পনার দিক হতে সেটা তাঁরা চাইলেন না। তাঁরা ভাবতেই

পারেনি নজরুল এ-ভাবে চলে যেতে পারে। বোধ হয় তাঁরা নজরুলকে বড় অসহায় প্রাণী ভাবতেন। কিন্তু সেদিন নজরুল যদি চলে না যেত, তবে তার পৌরুষ প্রচণ্ড ঘা খেত। নার্গিস সংক্রান্ত কথা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া আর কাউকে সে বলেনি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সেদিন নজরুলের বড় বন্ধু ছিলেন। আমার স্মৃতি ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য আমি কিছুদিন আগে শৈলজানন্দকে জিজ্ঞাসা করেও জেনেছি যে তাঁর নিকটেও নজরুল এই একই কথা বলেছিলেন।

বিশ দশকের কথা। অর্থাৎ ১৯২৭ থেকে ২৯ সালে বেশ কয়েকবার কবি ঢাকায় যান। মুসলিম সাহিত্য সমাজের আমন্ত্রণে তিনি তাদের বিভিন্ন অধিবেশনে যোগ দিলেও ঐ উপলক্ষে বেশ কিছুদিন তিনি ঢাকা সহরে বসবাস করেন।

তখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সুরেন্দ্র মৈত্রেয়। তিনি শুধু শিক্ষাবিদই ছিলেন না সাহিত্য ও সঙ্গীত শিল্পীরূপেও তখনকার দিনে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল। তাঁর স্ত্রী উর্মিলা দেবী ছিলেন বিশিষ্ট পিয়ানোবাদিকা। ঐ সুবাদে সহরের রুচিশীল সাহিত্যিক-শিল্পীর আনাগোনা তাঁদের বাড়িতে লেগেই থাকত। ওস্তাদ হায়দার খাঁর কাছে সুরেশচন্দ্র এবং উর্মিলা দেবীর তরুণী কন্যা উমা তখন সেতার শিখতেন। তরুণী উমা রূপে-গুণে সকলেরই মন জয় করেছিল। ঐ সমসাময়িকালে বিখ্যাত দিলীপকুমার রায় উমাকে গান শেখাতেন। গানের শিক্ষক হিসাবে দিলীপবাবুরও উমাদের বাড়িতে তখন খুব যাতায়াত ছিল।

এদিক ঢাকায় ততদিনে কবি নজরুলের নামডাক দারুণভাবে ছড়িয়ে পড়ল। গান-বাজনা, কবিতা রচনা সবকিছুর জন্যই নজরুলের তখন জনপ্রিয়তা। তার ওপর কবির রূপ এবং মধুর ব্যবহার। তরুণ কবি যেখানে যান, সেখানেই তাঁর আদর আপ্যায়ন। একদিন তিনি গিয়ে হাজির হলেন অধ্যক্ষ এবং শিল্পী সুরেন্দ্র মৈত্রেয়র বাড়ি। অনেকের অনুরোধ আর আবেদনে তিনি সেখানে হারমনিয়ম নিয়ে

বসতে বাধ্য হলেন। ঘর ভর্তি লোক। কবিকে দেখার জন্য দারুণ ভীড়। বাড়ির লোকজন সকলেই গর্বিত, কবিকে তাঁদের বাসভবনে একান্তভাবে পেয়ে। কবিও খুশি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আর শিল্পীর পরিবারের সঙ্গে তিনি মিলেমিশে গেলেন। হাসি-গান, আবৃত্তির পর আবার গান। কবি এবার দরাজ ভাষায় সুর তুললেন :

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে
দিসনে আজি দোল
আজিও তার ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি
তন্দ্রাতে বিলোল
আজও হায় রিক্তশাখা উত্তরী বায়
ঝুরছে নিশিদিন,
আসেনি দখনে হাওয়া গজল গাওয়া
মৌমাছি বিভোল।
কবে যে ফুল-কুমারী ঘোমটা চিরি
আসবে বাহিরে—
শিশিরের স্পর্শ সুখে ভাঙবেরে ঘুম
রাঙাবেরে কপোল।
ফাগুনের মুকুল জাগা দুকুল ভাঙা
আসবে ফুলের বান্
কুঁড়িদের ওষ্ঠ পুটে লুটবে হাসি
ফুটবে গানে টোল।...

কবির গান গৃহকর্তা এবং সঙ্গীতজ্ঞ সুরেশ মৈত্রেয় এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের মন জয় করল। গানপাগলা তরুণী উমারও তখন নজরুলের প্রতি দারুণ আকর্ষণ। দেখতে দেখতে গায়ক-কবি নজরুলের সঙ্গে ঐ পরিবারের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল, এবং কখন কীভাবে যেন নজরুল গানের মাস্টার হয়ে গেলেন। ঢাকার ঐ

দিনগুলির স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে কবি-বন্ধু ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন লিখেছেন : এবারে নজরুলের পরিচয় হয় পরমা সুন্দরী নোটনের (উমা মৈত্রেয়র) সঙ্গে। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্র মৈত্রয় ও উর্মিলা দেবীর কন্যা।…দিলীপ রায় আর নজরুল ইসলাম দু'জনই উমার গানের মাস্টার। দিলীপ আগে যা শিখিয়ে গিয়েছিলেন তার চেয়ে ভাল স্বরচিত গান শেখাবেন, এই ছিল নজরুলের পণ। এদিক দিয়ে নজরুল অনেকটা সফলতাও লাভ করেছিলেন। …আমিও অনেক সময় দর্শকভাবে যেতাম। (বেতার বাংলা, ১৬.১০.৭৬)

সঙ্গীত প্রেমিক নজরুলকে ঢাকায় অবশ্য ঐ সময় বেশ দুর্ভোগও পোহাতে হয়। এমন কি এক সময় ঢাকায় বেশ কিছু যুবকের হাতে তিনি দারুণভাবে লাঞ্ছিতও হন।

ঢাকার বনগাঁ অঞ্চলেব কাছাকাছি টিকাতুলি গ্রামে কবি রেনুকা সেন নামে জনৈক তরুণীকে এক সময় গান শেখাতেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর ছাত্রী রেনুকার সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে বেশ নাম ডাকও হয়। অতঃপব ঐ নবীন শিল্পীর কয়েকখানি গানের রেকর্ড দারুণ জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে গানের মাস্টার নজরুলের খ্যাতিও তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বনগাঁ অঞ্চলেই তখনকার দিনে সোম পরিবারেরও খুব খ্যাতি। ঐ জমিদার পরিবাবেও নজরুলের যাওয়া-আসা ছিল। সোমেদের বাড়ির রানু সোম তখন কবির গানে মুগ্ধ। তরুণী রানুর তখন গান বাজনায় বেশ আগ্রহ। অবশেষে একদিন নজরুলকে রানু সোমের গানের মাস্টার হিসাবে দেখা গেল। তারপর প্রায় নিয়মতই তিনি প্রিয় ছাত্রী রানুকে গান শেখাতে যান।

গান-বাজনা নিয়ে যখন নজরুল সোমেদের বাড়িতে যাওয়া আসা শুরু করলেন, তখন পাড়ার যুবকদের কাছে তা প্রায় অসহ্য বলে মনে হল। একজন অহিন্দুর যখন তখন হিন্দু বাড়ির অন্দর মহলে যাতায়াত! এ যেন তাদের কল্পনারও অতীত। হিংসা ঈর্ষা অথবা বিদ্বেষ যাই হোক না কেন, যুবকরা ক্রমে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারপরের

ঘটনা মোতাহার হোসেনের রচনাতেই স্পষ্ট। তিনি লিখেছিলেনঃ··· কোনও এক রাত্রিতে ৯টা/৯॥ টার সময় নজরুল দোতলা থেকে নেমে আসার সাথে সাথেই ৭/৮ জন জওয়ান মর্দ নজরুলকে লাঠোষধি দিয়ে শায়েস্তা করতে শুরু করল। কিন্তু আখেরে দেখা গেল নজরুলও ফিরে উল্‌টে ধা করে অগ্রবর্তী একজনের উদ্যত হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে পিটাতে পিটাতে এদের অগ্রগতি রোধ করে দ্রুত পশ্চাত গতিতে পরিণত করল। এই ভাবে ছত্রভঙ্গ হওয়াতে যুদ্ধে নজরুলেরই জয় হল।···

যে রানু সোমকে গান শেখানো নিয়ে ঢাকার বনগাঁয়ে ঐ "ক্ষুদে যুদ্ধের" সৃষ্টি হয়েছিল, সেই রানু সোমই পরবর্তীকালের সুপরিচিত লেখিকা প্রতিভা বসু। নজরুল-বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে রানু দেবীর বিয়ে হয় এবং তারপর থেকে তিনি প্রতিভা বসু নামেই খ্যাত।

বাস্তববাদী নজরুল কাল্পনিক নজরুলকে কখনও হার মানাতে পারে নি। তাঁর কল্পিত গাল-গল্প বন্ধুদেরও মাঝে মধ্যে বিভ্রান্ত করত। প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসার ফুল ফুটাতে তিনি অনেক সময়ই কল্পনার আশ্রয় নিতেন।

কবিবন্ধু ডঃ কাজী মোতাহার হোসেনের লেখা থেকেও তার প্রমাণ মেলে। এক সময় নজরুল ও ডঃ হোসেন ঢাকায় বর্দ্ধমান হাউসে একসঙ্গে দিন কয়েক ছিলেন। সেই সময়কার একটা ঘটনার উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ···নজরুল ও আমি 'বর্ধমান' হাউসে রাত্রিকালে শুয়েছিলাম। কিন্তু রাত ১০/১১ টার সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙায় দেখতে পেলাম নজরুল নাই। কী হলো? আমরা রইলাম খুব উদ্বেগে। পরে ৭/৭॥ টায় নজরুল এসে হাজির। ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করতে একটা গল্প শুনলাম—দুপুর রাত্রে হঠাৎ চোখ খুলে দেখি একটা নীল গোলাকার আলো দরজায়। আমাকে বলল, পিছনে পিছনে এসো। আমি সে আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলাম না। চললাম পিছে পিছে। আলোটা বর্দ্ধমান হাউস থেকে নেমে আস্তে আস্তে মিন্টোরোড্ পার হয়ে কার্জন হল বাঁয়ে রেখে রেল রাস্তা পার হয়ে, হাসিনা মন্‌জিল

ছাড়ায়ে ফজিলতুন্নেসার বাড়ির সামনে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল কে যেন একটা মৃদু শব্দ করছে, 'আয়—আয়'। দরজায় ঠেলা দিয়ে দেখি, দরজা খুলে গেল। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে উঠলাম ফজিলতের শোবার ঘরে। সে বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার পাশে একটা চেয়ার রাখা। সেই চেয়ারে বসতেই ধড়মড় করে ফজিলত উঠে বসল। তারপর সারারাত্রি বিছানায় আর চেয়ারে।···

কবির কথায়, অথবা কবিবন্ধুদের লেখায় যেসব তথ্য প্রকাশিত, তা' থেকে বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, বিদ্রোহী কবির জীবনেও ফুটেছিল ভালবাসার অনেক ফুল। সেইসব ফুলের সৌরভে তিনি যেমন আমোদিত হয়েছেন, ফুলের কাঁটায় হয়েছেন তেমনি আহত। কিন্তু তবুও বিদ্রোহী কবির গতিকে কোন বাধাই ব্যাহত করতে পারেনি। বরং জানা-অজানা অজস্র প্রেমের ঘটনা নজরুলের জীবনে সৃষ্টি সুখের উল্লাস আনতে আশাতীতভাবে সাহায্য করেছে। এখানেই কবির প্রেম সার্থক।

স্বদেশ প্রেম

আজাদী অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া এবং হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য।......কোন বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হতে মুক্ত হোক। মুক্তপ্রাণে মুক্ত বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেইদিন হবে অভিযানের শেষ।

—নজরুল

পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম কানুন বাঁধন শৃঙ্খলা মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ'। বলতে হবে, 'যে যায় যাক, সে আমার হয়নি লয়'।

এই উক্তি নজরুলের। রাজনৈতিক সচেতন নজরুলের রাজনীতির মঞ্চে প্রকাশ্য আবির্ভাবের সঠিক দিনক্ষণ এখনও অনির্দিষ্ট। তবে অতীতের বহু তথ্য ঘটনা প্রমাণ দেয় তরুণ নজরুল সর্বপ্রথম প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নেন কুমিল্লা সহরে—১৯২১ সালের মাঝামাঝি কোনও এক সময়।

সারাদেশে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে তখন অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। গান্ধীজীর আহ্বানে দেশের মানুষ সবে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য তৈরি হচ্ছেন। সহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে স্বাধীনতার দাবিতে তখন গণ-জাগরণের জোয়ার। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে মমাহত হতাশ কবি তরুণ নজরুল কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাড়ির একজন অতিথি।

তার দিন কয়েক আগে তিনি কুমিল্লার দৌলতপুর গ্রাম থেকে পালিয়ে এসেছেন। নার্গিস আর তাঁর মামা আলি আকবরের প্রতারণার শিকার নজরুল অত্যন্ত হত-উদ্যম। মনেপ্রাণে ভরা ক্ষোভ আর প্রতিহিংসার জ্বালা। ঠিক ঐ সময় কুমিল্লায় রাজনৈতিক আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এছাড়া সেনগুপ্ত পরিবারের ছোট বড় সকলেই ছিলেন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের অন্ধ অনুগামী। ঐ পরিবেশ আর আবহাওয়া তাঁর মনের জ্বালা আর ক্ষোভকে আরও শতগুণ তীব্র করে তুলল। ব্যক্তিপ্রেমের ব্যর্থতা স্বদেশ প্রেমের বলি হল। কবির মনে জমা ক্ষোভ আর বেদনার জ্বালা স্বাদেশিকতার ফুল হয়ে ফুটল। তাই তিনি গান্ধীজী এবং তাঁর অহিংস আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখলেন :

এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো
বন্দিনী-মা'র আঙিনায়।
ত্রিশকোটি ভাই মরণ-হরণ
গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়॥...

ক্রমে সারাদেশে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন : বিদেশী পণ্য বর্জন কর। স্বদেশী কেনো। আর ঘরে ঘরে চরকা চালিয়ে সুতা কেটে কাপড় তৈরি কর। বিদেশী ইংরাজ শাসক এবং শোষকদের সঙ্গে কোন রকমেই আর সহযোগিতা নয়—অসহযোগিতা।

গান্ধীজীর চরকার ডাক দেশে নতুন প্রাণের সঞ্চার করল। জাগ্রত জনতা বিদেশী কাপড় বর্জন করে স্বদেশে তৈরি খদ্দর ধরল। নজরুল সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, নেংটি পরা এক ফকিরের ইঙ্গিতে আসমুদ্র হিমাচল মন্ত্রমুগ্ধ। সর্বত্র এক কথা, এক গান। সে গান স্বরাজ আর স্বাধীনতা, গান্ধাজী আর চরকার। তরুণ নজরুলও গান্ধীজীর আহ্বানে উদ্দীপ্ত। তিনি বুঝলেন ঐ চরকার শব্দেই একদিন স্বরাজের সিংহদুয়ার খুলতে বাধ্য। স্বদেশী আন্দোলন আর স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে তিনি চরকাকেও একসূত্রে বেঁধে নিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সম্মিলিত অভিযানই যে মহাত্মাজীর চরকার চাকা শতগুণ জোরদার করতে পারে এ সত্যটা নজরুল হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাই চরকার উদ্দেশে কবি তাঁর মনের ভাব নিবেদন করে লিখলেন :

তোর ঘোরার শব্দে ভাই,
সদাই শুনতে পাই
ঐ খুলল স্বরাজ সিংহ-দুয়ার,
আর বিলম্ব নাই।
ঘরে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি
কাটল দুখের রাত্রি ঘোর॥

হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর
তাদের মিলন-সূত্র ডোররে—
রচিল চক্রে তোর—
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
আবার তোর মহিমায় বুঝল দু'ভাই
মধুর কেমন মায়ের ক্রোড়!

দেখতে দেখতে প্রেমাহত নজরুলের মন কঠোর-কঠিন হল। তিনি কবিতা লেখেন। গানে সুর তোলেন। আর পাশে বসে তাঁকে সহায়তা করে কিশোরী প্রমীলা। স্বদেশ প্রেমের মনে উদ্দীপ্ত কবির চেতনার পাশে কিশোরী প্রমীলাই প্রাণের হাওয়া জোগায়। ততদিনে সারাদেশে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। বিদেশী শাসক গান্ধীজীর ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতায় বিচলিত। আন্দোলনের বেগ ক্রমে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়। মদমত্ত ইংরাজ সরকার তখন কাতারে কাতারে স্বদেশী-করা মানুষকে গ্রেপ্তার করে জেল কারাবাসে পাঠায়। বন্দী-জীবনকেও কেউ পরোয়া করে না। মুক্তি আন্দোলন এবং কারাবাসকে তারা স্বাগত জানায়। তরুণ কবি নজরুল এবার আরও উৎসাহিত, উদ্বেলিত। বিস্মিত কবির লেখনি আবার মুখর :

আজি রক্ত নিশির ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে ?
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়াতলে ॥

... ...

ললাটে জয়টিকা, প্রসূন-হার গলে
চলেরে বীর চলে—
সে নহে নহে কারা যেখানে ভৈরব
রুদ্র-শিখা জ্বলে ॥

স্বদেশী আন্দোলনের বীর-বিপ্লবীদের প্রশংসায় কবি যেমন মুখর হয়েছেন, তেমনি ধিক্কৃত করেছেন কাপুরুষ আর মরণ-ভীতুদের। তিনি বিশ্বাস করতেন, বীরের মৃত্যু হয় একবারই। কিন্তু কাপুরুষের মৃত্যু বারবার, পদে পদে। বহুবার তাদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করে জীবনজয়ী হতে কবি আহ্বান জানিয়ে লেখেন:

জ্ঞান-বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া!
মুক্তিদাতা মরণ, এসো কালবোশেখীর বেশে
মরার আগেই মর্‌ল যারা নাও তাদেরে এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগছে তোমার মরণ-হরণ্-শরণ॥

কুমিল্লায় বসে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও তারও প্রায় এক বছর আগে কবি নজরুল গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন।

সেটা ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। গান্ধীজী প্রস্তাব করলেন: বিদেশী পণ্য বর্জন কর। বিদেশী সরকারের সঙ্গে করো সম্পূর্ণ অসহযোগিতা। গান্ধীজীর ঐ সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হল। ঘুমন্ত ভারতবর্ষ যেন মুহূর্তেই জেগে উঠল। জাগ্রত ভারতের প্রতিটি প্রান্তে সম্মিলিত ধ্বনি উঠল: অসহযোগ, অসহযোগ, অসহযোগ। কন্যা কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত ঐ মন্ত্রধ্বনি উচ্চগ্রামে প্রতিধ্বনিত হল। একটা নতুন আবেগের ঢেউ সারা দেশে মুক্তিমন্ত্রের প্লাবন সৃষ্টি করল।

তার মাত্র ছয় মাস আগের কথা। তরুণ নজরুল সমর-শিবির ছেড়ে কলকাতা ফিরেছেন। তার আগে তাঁর পরিচয় ছিল হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। অভাব অনটনে নজরুলের লেখা-পড়া আর তেমন হয়নি। তাই তাঁর মনে দারুণ ক্ষোভও ছিল। তারপর পিতৃহীন

তরুণ একদিন সেনাবিভাগে নাম লিখিয়ে সামান্ত এক সৈনিকের চাকুরি নিয়ে দেশ-ছাড়া হন।

করাচির সেনা-শিবিরে বসেও নজরুলের মনে যেন কোনও তৃপ্তি নেই। কী না পাওয়ার বেদনায় যেন তিনি অশান্ত অধীর হয়ে উঠেন। তারপর সেনা-শিবিরেরই সহকর্মী এক পাঞ্জাবী মৌলভির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। মৌলভি সাহেব ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত এবং ধর্মভীরু। তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে নজরুল পারস্য-কবিদের নানা কাব্য ও কবিতা পড়ার সুযোগ পান। অশান্ত আর অতৃপ্ত মনকে শান্ত তৃপ্ত করার জন্ম তিনি অবসর সময়ে মৌলভি সাহেবের সঙ্গে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরবর্তী জীবনে কবি নজরুল ঐ মৌলভি সাহেবের কথা স্মরণ করেছেন। 'রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ' নামক অনুবাদ কাব্যের মুখবন্ধে নজরুল লিখেছেন :···আমি তখন ইস্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি। সে আজ ইংরাজির ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী-মৌলভি সাহেব থাকতেন। তাঁর কাছে ক্রমে ফরাসী কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই পড়ে ফেলি।···

তখন নজরুল সমর-শিবিরে বসে শুধু বিদেশী কাব্য কবিতাই পড়েন না, তাঁর কৈশোরের নেশা গল্প কবিতা লেখার চর্চাও অব্যাহত রাখেন। বাংলার মাটি বাংলার জল ছেড়ে গিয়ে সুদূর করাচির সমর শিবিরে বসেও জন্মভূমি বাংলা তথা তাঁর বর্দ্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামকে ভুলতে পারেন না। সেনা-শিবিরের বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে বসেও তিনি যে সব গল্প-কবিতা লেখেন, তাতে তাঁর স্বদেশ প্রীতির সুর ফুটে ওঠে।

১৩২৬ সাল। ঐ বছর বাংলায় যে প্রাকৃতিক ঝড় আর বন্যা হয়েছিল, তা তুলনাহীন। সেই ঝড়ের মধ্যে বাংলার সাহিত্য-আকাশে আরেক ঝড় উঠল। সে ঝড় তুললেন এক তরুণ সাহিত্যসেবী। সেই সাহিত্যসেবীই হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। ঐ বছরের মাসিক 'সওগাত'. পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প ছাপার

একেবারে worthless হলেও, আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক আর ওটা বোধহয় সব লেখককের পক্ষেই স্বাভাবিক।...

নিবেদক ইতি

—নজরুল ইসলাম

'সবুজপত্র' তখনকার দিনের এক নামকরা সাহিত্য পত্রিকা। প্রমথ চৌধুরী অর্থাৎ বীরবল তার সম্পাদক। করাচীর সেনা শিবির থেকে সবুজপত্রে প্রকাশের জন্য। কবিতাখানির নাম 'আশায়'। একটু রোমান্টিক। সম্পাদক মশাই কবিতাখানি মনোনীত করলেন না। সবুজপত্র অফিসে তখন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও কাজ করেন। তিনি অমনোনীত কবিতা 'আশায়' নিয়ে পড়লেন, তার বেশ ভাল লাগল রোমান্টিক ঐ কবিতখানি। কবি তখনও তাঁর কাছে অপরিচিত। তবুও পবিত্রবাবু কবিতাখানি নিজে হাতে নিয়ে সটান প্রবাসী পত্রিকা দপ্তরে গেলেন। প্রবাসী সম্পাদক কবিতাখানি পড়ে তা মনোনীত করলেন। তারপর প্রবাসীর পৌষ সংখ্যায় (১৩২৬) কবিতাখানি প্রকাশিত হল :

নাইবা পেল নাগাল, শুধু সৌরভের আশে
অবুঝ সবুজ দুর্বা যেমন যূঁই-কুড়িটির পাশে
বসেই আছে, তেম্‌নি বিভোর থাক্‌বে প্রিয়ার আশায়,
তার অলকের একটু সুবাস পশবে তোর এ নাশায়।
বরষ শেষে একটি বারও প্রিয়ার হিয়ার পরশ
জাগাবেরে তোরও প্রাণে এমনি অবুঝ হরষ।

প্রবাসীর পাতায় কবি নজরুলের এই কবিতা পড়ে পাঠক পাঠিকারা এবার যেন নতুন করে এক কবিকে আবিষ্কার করলেন। আগেই বলা হয়েছে, তখন পর্যন্ত কবির সঙ্গে পবিত্রবাবুর আলাপ পরিচয় ছিল না। এ প্রসঙ্গে পবিত্রবাবু তার 'চলমান জীবনে' লিখেছেন : . নজরুল তখন করাচিতে পল্টনের সঙ্গে। আমি তাকে

জানালাম, সবুজপত্রে এ কবিতাটি প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় আমি নিজের দায়িত্বে তার অনুমতি না নিয়েই প্রবাসীতে সেটি ছাপিয়েছে। এর জন্য যদি তার কোন ক্ষোভের কারণ হয় দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার।...

তার উত্তরও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রবাবু পেলেন। আশায় প্রকাশের নেপথ্য কাহিনী জেনে সেনা শিবির থেকে কৃতজ্ঞ নজরুল লিখলেন : প্রবাসীতে বেরিয়েছে 'সবুজপত্রে' পাঠানো কবিতা। ওতে কবিতার মর্যাদা বেড়েছে, কি কমেছে, তা আমি ভাবতে পারছি না। সবুজপত্রের নিজের আভিজাত্য থাকলেও, প্রবাসীর মর্যাদা একটুও কম নয়। প্রচার আরও বেশি। তাছাড়া আমি কবিতা লিখছি। পারসি কবি হাফেজের মধ্যে বাংলার সবুজ দুবা ও যুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চূর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে সবই তো খাঁটি বাংলার কথা, বাঙালীর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দ রসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কতশত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির ভেজা সবুজ বাংলা। ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে বসে এই চিরন্তন প্রেমিক মনের সমভাব আমি চাক্ষুস করলাম, আমার ভাষায়, আমার আপনার জন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই একটুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানিনা, যুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও দুর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কিনা। তবু বাঙালীর সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একান্তবোধ য'দ জাগাতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। অবশ্য বাঙালীর কাছে পৌঁছে ও যোগ্য বাহনে পরিবেশ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার।...

সুদূর সেনা-নিবাসে বসে তরুণ নজরুল পবিত্রবাবুর যে ভালবাসার স্পর্শ পেলেন, তাতে তার মন ভরে গেল। পবিত্রবাবুকে নজরুল আরও লিখলেন :...চুরুলিয়ার নেটোদলের গান শিখিয়ে ছোকরা নজরুলকে কেই বা এক কানাকড়ি দাম দিয়েছে। স্কুল পালানো, ম্যাট্রিক-পাশ না করা পল্টন ফেরৎ বাঙালী কী নিয়েই বা সমাজে

প্রতিকার আশা করবে। আমার একমাত্র ভরসা মানুষের হৃদয়। হয়তো তা আগাছা ঘাসের মত অঢেল খুঁজে পাওয়া যায় না কিন্তু বাংলা দেশে যে তা দুর্লভ নয় তার প্রমাণ আমি এই সুদূর থেকেও পাচ্ছি।..

কেউ কাউকে চেনেন না। জানেন না। শুধু মাত্র পত্রালাপ। তবুও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে।

একজন বাংলার সাহিত্যসেবী। অন্যজন সুদূর করাচির সেনা শিবিরের হাবিলদার-কবি। দু'য়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। কিন্তু মিল তার চেয়েও আরও অনেক বেশি। দু'জনই বাংলা সাহিত্য আর বাংলাদেশকে ভালবাসেন।

করাচির সেনা শিবিরে একদিকে রাইফেল প্যারেডের তাল, যুদ্ধের প্রস্তুতি, অন্যদিকে কাগজ-কলম আর স্বপ্নের আকাশ। ফৌজী সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে নজরুল তাঁর সৃষ্টির বীণায় সুর তোলেন। পোড়া বারুদের গন্ধের মধ্যে তিনি যুঁই-মালতি আর চম্পা চামেলির সৌরভ খুঁজে পান। আগ্নেয়গিরির পাশে কৃষ্ণচূড়ার ফুল। এই দ্বৈত জীবনের টানা পোড়েনে কবির নতুন জীবন শুরু হল। তরুণ কবি যুবশক্তির উদ্দেশ্যে নতুন আহ্বান জানালেন :

অভয়-চিত্ত ভাবনা মুক্ত যুবারা শুন!
মোদের পিছনে চীৎকার করে পশু-শকুন।
ভ্রুকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণশীল বুড়োরা করিছে তাহারি স্তব।
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল!
নির্ভীক বীর পথিকদল,
জোর কদম চল্‌রে চল॥

যুবকদের জোর কদমে এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়ে কবি নিজেও এগিয়ে চললেন নব পথের সন্ধানে। সেটা ১৯২০ সালের মার্চ মাস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উন্মাদনা শেষ হ'ল। বিদেশী ইংরাজ শাসকরা উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙে দিল। ঐ রেজিমেণ্টের সেনারা

বিদায় সঙ্গীত গাইতে গাইতে আবার যে যার ঘরে ফিরল। যুদ্ধ-ফেরৎ লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকদের নিয়ে সারাদেশে আবার নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। যুদ্ধ শেষে যদিও বা শান্তি এল কিন্তু বেকার সমস্যা দেশে আবার অশান্তির ঝড় তুলল।

নজরুলও করাচি থেকে সরাসরি কলকাতা ফিরলেন। তার আগে অবশ্য সেনা শিবিরে থাকাকালে নজরুল বাংলার সাহিত্য জগতে নিজেকে পরিচিত করে নিয়েছিলেন। হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের গল্প কবিতার স্বাদ ততদিনে বাঙালী পাঠক গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাই নজরুল যুদ্ধ-শিবির ছেড়ে এসে সাহিত্য সাধনার পথ গ্রহণ করবেন বলেই স্থির করলেন। সরাসরি কলকাতা এসে উঠলেন তাঁর একদা সহপাঠী বন্ধু শৈলজানন্দের কাছে। তিনি তখনও বাগবাজারের রামাকান্ত ষ্ট্রীটের এক মেস বাড়িতে থাকতেন।

ক'দিন যেতে না যেতে ঐ মেস বাড়িতে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। কী করে যেন মেসের ঠাকুর জানতে পারল, শৈলজানন্দের নবাগত যুদ্ধ ফেরৎ বন্ধু একজন মুসলমান যুবক। এ নিয়ে মেসবাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হল। শৈলজানন্দ ব্যাপারটা আঁচ করে ফেললেন। নজরুলও সম্পূর্ণ বিষয়টা ধরে ফেললেন। তারপর দুই বন্ধু মিলে বসলেন কী করে কোথায় যাওয়া যায়। ঐ মেস যে আর তাঁদের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় নয়—তা তারা বুঝতে পারলেন। তাই পরের দিন কবিকে নিয়ে শৈলজানন্দ কলেজ ষ্ট্রীটের ৩২ নং বাড়ির দোতলায় গিয়ে হাজির হলেন। ওটা ছিল বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির কার্যালয়। মুজফ্ফর আহমেদ সাহেব তখন ঐ বাড়িতেই থাকতেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন: রামাকান্ত বোস ষ্ট্রীট হয়ে এলেও কাজী নজরুল ইসলাম শেষপর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে আস্তানা গেড়ে বসলেন।

সেদিনের নজরুল সম্বন্ধে তিনি আরও লেখেন: কৌতূহল বশে আমরা তাঁর (নজরুলের) গাঁটরি বোচ্কাগুলি খুলে দেখলাম। তাতে

তাঁর লেপ-তোষক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক-পোশাক তো ছিলই আর ছিল শিরওয়াণি (আচকান), ট্রাউজার্স ও কালো উঁচু টুপি—যা' তখনকার দিনে কয়াচির লোকেরা পরতেন। একটি দূরবীনও (বাইনোকুলার) ছিল। কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি-পুস্তক মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদিও ছিল।…

যুদ্ধফেরৎ কবি নজরুল প্রথমে কলকাতা এসে বন্ধুদের কাছে উঠেছিলেন কিন্তু ক'দিন থাকার পর তিনি স্থির করলেন, কবি তাঁর জন্মগ্রাম স্মৃতি বিজড়িত বর্দ্ধমানের চুরুলিয়ায় একবার যাবেন এবং মাকে দেখে আসবেন। তারপর একদিন কাউকে আগে ভাগে কিছু না জানিয়ে চুরুলিয়া গিয়েও হাজির হলেন। সেখানে প্রায় সপ্তাহ খানেক তিনি ছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কোনও কারণে বিধবা মায়ের সঙ্গে কবির মতান্তর ঘটে। ফলে দারুণ মনোব্যাথা আর অভিমান নিয়ে তরুণ কবি কলকাতা ফিরে আসেন। বলাবাহুল্য, অভিমানী কবির অভিমান এতই গভীর ছিল যে, সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি আর কখনও তাঁর জন্মভূমি চুরুলিয়া গ্রামে যাননি এবং মায়ের মুখদর্শনও করেন নি।

এ প্রসঙ্গে কবি-বন্ধু মুজফফর আমেদ লিখেছেন : নজরুলের মান অভিমানের ব্যাপারটি যে কত গভীর ছিল, আরও একটি ঘটনা হতে আমি তা' পরে বুঝেছিলাম। ১৯২১ সালে সে যখন আমার সঙ্গে ৩/৪সি, তালতলা লেনের বাড়িতে থাকছিল, তখন একদিন তার বড় ভাই কাজী সাহেবজান ও তার কাকা কাজী ফজাল করীম সে বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। নজরুলকে একবারটি চুরুলিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক সাধাসাধি করলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে রাজী হলেন না।…

ঘটনার পর ঘটনা। অভাব-অভিযোগ, মান-অভিমান এবং সাহিত্য-সাধনার হাজারো ভীড়ের মধ্যে একের পর এক ঘটনা তরুণ কবিকে ক্রমে বাস্তববাদী করে তুলল। তিনি তখন একটি চাকুরির জন্য

দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমনি এক ঘটনাবহুল দিনে তাঁর জীবনে আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটল।

'সবুজপত্র' অফিস। সেখানে কাজ করেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। অফিসে ঢুকতেই কে একজন পবিত্রবাবুকে বললেন: আপনাকে খুঁজতে এক বাঙালী মিলিটারিম্যান এসেছিলেন।

বাঙালী মিলিটারিম্যান! কথাটা শুনে অবাক হলেন পবিত্র-বাবু। প্রথমে তিনি রহস্যটা কিছু বুঝতে পারলেন না। তারপর তাঁর টেবিলের ওপর রাখা একটি চিরকুট পড়ে আবার অবাক। তাতে লেখা:

[পবিত্রবাবু, কাল কলকাতা এসে পৌঁছেছি। দেখা করতে এলাম। কিন্তু বরাত খারাপ। আছি ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে। বাড়িটা আপনার সুপরিচিত। দেখা পাওয়ার আগ্রহে বসে থাকব।

- হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম]

চিরকুটখানি পড়ে পবিত্রবাবু আনন্দে আত্মহারা প্রায়। এই সেই কবি, যিনি সেনা শিবির থেকে কবিতা গল্প পাঠান। যার নেশায় পাঠক-পাঠিকা নতুন রসের স্বাদ পেয়েছে। কদিন আগেও অবশ্য ডাকে তিনি নজরুলের আরেকটি চিঠি পেয়েছিলেন। তাতে পবিত্র-বাবুকে কবি জানিয়েছিলেন, বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই দেশে ফিরে আসছি।

পবিত্রবাবুর দারুন আনন্দ হল। আনন্দ হওয়ার কারণ আরও অনেক। তিনিই প্রথম ঐ অদেখা-অচেনা কবির পাঠানো প্রথম কবিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। হাবিলদার কবির মিষ্টি লেখা তিনি পড়তেন, মিষ্টি হাতের চিঠিও। পত্র মিতালীও গড়ে উঠেছিল দু'জনের মধ্যে কিন্তু হাবিলদার কবিকে তখনও তিনি দেখেননি। দু'জন দু'জনের অতি পরিচিত হয়েও একেবারে অচেনা। তাই তাঁর আর অফিস ছুটি পর্য্যন্ত দেরী সইল না। পবিত্রবাবু চোখ মুখ এবার যেন মুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হাবিলদার-কবিকে চাক্ষুস করার জন্ত তিনি তখন অত্যন্ত চঞ্চল। সেদিনের সেই ঘটনাটি পবিত্রবাবু তাঁর

বিখ্যাত 'চলমান জীবনে'র পাতায় সরসভাবে যে বর্ণনা করেছেন তাও এক ইতিহাস। তিনি লিখেছেন : অফিস ছুটি পর্যন্ত আমার দেরী সইল না। অনুমতির অপেক্ষা ছিল না বটে, তবু শশীবাবুকে জানিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

—সেই ঘোড়ায়-চড়া ছেলেটির কাছে ছুটলেন বুঝি ?

—ঘোড়ায় চড়া কেন ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

| ওরে বাবা, ঘোড়ায় চড়া নয় ? 'খাকি পোশাক। পা-চাপ পাৎলুম হাঁটু পর্য্যন্ত বুট। যে রকম গটগট করে এসে ঢুকল, মনে হল, যেন দোরগোড়ায় ঘোড়াটা থামিয়ে এসেছে ! সেটার মুখ দিয়ে ফেণা কাটছে এখনও।

—লড়াই ফেরৎ কিনা। হাবিলদার। সেই রেশ—এখনও বোধহয় কাটেনি।

—তা, আপনি যে চিঠি পাওয়া মাত্রই ছুটলেন ? শ্যামের বাঁশি বাজার পরে রাধিকারও ঘর ছাড়তে একটু বেশি সময় নিত।

--আপনি আবার এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণ টেনে আনলেন দেখছি। হেসে ফেললাম আমি।

—টেনে আনলাম কি সাধে মশায়, শশীবাবু বললেন, পরণে ঘোড়সোয়ারি পোশাক থাকলে কি হবে ? মাথায় ইয়া ফোঁপানো বাবরি চুল। মোহন চূড়া কাঁধে দিলেই হয়। আর মুখখানিও ননীগোপালের মত নধর। ইয়া বড় টানা টানা চোখ।

—আমি হলাম সেই শ্রীকৃষ্ণের রাধা না শশীবাবু ? আর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনি তার নাক মুখ চোখ চাউনি বুকের মধ্যে গেঁথে নিয়েছেন।

—আমি গেঁথে নেব কেন ? সে যে নিজে থেকেই গেঁথে দিয়ে চলে গেল।

শশীবাবু বললেন, বেশ বুঝতে পারছি যেন একটা অদ্ভুত কী লুকিয়ে আছে তার ভিতরে।

—আমি যাই, দেখে আসি। আমি বললাম।

—ও আপনি বুঝি এখনও দেখেনইনি তাকে? তাহলে আর দেরী করবেন না। চলে যান।

আমি বেরিয়ে এলাম। পিছন থেকে শুনলাম, শশীবাবু স্বর করে বলছেন: না দেখতেই ভালবেসেছি।

মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যালয়। সেখানে গিয়ে হাজির হলেন পবিত্রবাবু। উদ্দেশ্য, অদেখা কবিকে দেখা এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করা। তখনও সমিতির অফিস খোলা হয়নি খোঁজ করে জানলেন, সন্ধ্যায় ঐ কার্যালয় খোলা হবে। প্রথমে পবিত্রবাবু একটু হতাশ হলেন। তারপর আবার নজরুলের রেখে আসা সেই চিরকুটটুকু খুলে তাঁর দেওয়া বাড়ির ঠিকানাটা মিলিয়ে নিলেন। দেখলেন, স্পষ্ট অক্ষরে লেখা, বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীট। এদিক-ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করতে পবিত্রবাবুর কানে হঠাৎ হারমনিয়মের সুর ভেসে এল। একটু এগিয়ে গিয়ে তিনি একটি ঘরে উঁকি মারলেন। দেখেন ভাঙা এক কাঠের তক্তাপোশে বসে ছোট্ট একফালি ঘরে এক তরুণ তন্ময় হয়ে সুর ভাঁজছেন। পরনে লুঙি আর গায়ে তার গেঞ্জি।

পবিত্রবাবু বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরজার বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমে তরুণের দরাজ গলায় সুর উঠল। সুর-ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল রেখে গায়ক মাথা নাড়ছেন, আর মাথা ভরতি বাবরি চুলের উপর যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

গান থামল। কিন্তু তরুণের চোখে-মুখে ক্লান্তি নেই। একটু ছেদমাত্র। তারপর আবার হারমনিয়মের রিডে আঙুল পড়ল। এক সুর থেকে অন্যসুর। তারই মধ্যে দরজার দিকে একবার নজর পড়ল। একটু লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন গায়ক-কবি। তারপর এক লাফে দরজার কাছে গিয়েই সরাসরি প্রশ্ন: আপনি নিশ্চয়ই পবিত্র গাঙ্গুলি?

পবিত্রবাবুকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই নজরুল

তাঁকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলেন। বললেন: জানতাম, খবর পেলে আপনি আর এক মুহূর্তও দেরী করবেন না।

আধভাঙা তক্তপোশের ওপর বসিয়ে নজরুল আবার উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা। বললেন: আমার বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয়নি যে আপনিই পবিত্রবাবু। হঠাৎ হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে আবার গান ধরলেন: 'সে যে আসবে আমার মন বলেছে…

গান আধ পথেই শেষ হল। নজরুল কী করবেন বুঝতে পারেন না। উচ্ছ্বাস-উল্লাস তাঁকে উতল করে তুলল। পবিত্রবাবুর দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে বললেন: অবশ্য অঙ্ক কষেও প্রমাণ করতে পারতাম যে আপনিই পবিত্র গাঙ্গুলি। যদিও অঙ্কে আমি বরাবরই নিরেট।

অবাক পবিত্রবাবুব অবাক প্রশ্ন: অঙ্ক কষে, মানে? অঙ্ক কষে আবার আমার আগমন-বার্তা জানা কী করে সম্ভব?

কবি আবার হাসলেন। তারপর হাতের চারটি আঙুল উঁচিয়ে ধরে বললেন: এই এতবড় কলকাতা সহরে আমাকে সব মিলে চেনে মাত্র চারজন। আর তাঁদের তিনজনকে আমি ইতিমধ্যেই দেখছি। অতএব চতুর্থজন আমার না দেখা প্রিয় পবিত্র গাঙ্গুলি না হয়ে যায় না! এতো অতি সহজ অঙ্ক!

নজরুলের কথায় পবিত্রবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন। নজরুলও দুই বন্ধুর প্রাণখোলা হাসির রোলে কলেজ স্ট্রীটের দোতলা ঐ পুরাণো বাড়ির কবুতরগুলিও ভয়ে আকাশে উড়ল!

পবিত্রবাবু পরবর্তীকালে নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম চাক্ষুস পরিচয়ের দিনটির কথা সুন্দরভাবে এঁকে রেখেছেন। স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে তিনি লিখেছেন:

…আমি চুপচাপ বসে মানুষটির কথা ভাবতে লাগলাম। কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য আছে। এ আগুন, না মাটি? যজ্ঞের লাল জবাফুল, না চিকন শ্যামল নব দুর্বা? দুই-ই বোধহয় একসঙ্গে মিলে

গেছে, মিশে গেছে একেবারে। তা নইলে পল্টনের শিবিরে বসে কেউ হাফেজের অনুবাদ করে? তাও যুঁইয়ের গন্ধে ভরা!

একটু পরেই ফিরে এল নজরুল। এক হাতে চায়ের কেটলি ঝুলছে। আর এক হাতে সিঙারার ঠোঙা। কলাপাতায় মোড়া এক গাদা পান।

—কি হে তুমি যে ফিস্টি বসাচ্ছ, দেখছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—বসাব না কেন? হেসে বললে নজরুল। বাঙালীর ছেলে। বহুদিন বাদে বন্ধু মিলন হলে খেয়ে দেয়ে উৎসব করেনা তো কি? চা-সিঙারা-পান, মজলিশ করবার তিন প্রধান রেস্ত।

টেবিল থেকে কাঁচের গ্লাস এনে নিজ হাতেই চা ঢেলে দিলে। তক্তপোশের উপর কাগজ পেতে ঢাললে সিঙারাগুলি।

চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: করাচি থেকে সোজা আসছ কলকাতায়?

—না দাদা, বাড়িতে দু'দিন থেকে এসেছি। লেট্‌র গান লিখেতো আর দিন চলবে না। লেখাপড়াও শিখিনি যে চাকুরি খুঁজব। কাজেই বন্ধুবান্ধব ভরসা। ভেবে ভয় হয়, তাদের ভরাডুবি না করি।

—তাদের ভরাডুবি করবে কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।

—আমি করব কেন? বললে নজরুল। আমার বোঝায় নদীই যে গর্জ্জে উঠেছে। শৈলজাকে তো শেষ পর্যন্ত মেস ছাড়াই হতে হল।

—শৈলজা কে? আর সে মেস ছাড়লই বা কেন?

—তা' হলে শোন সব গল্প। ইস্কুল জীবনের সব বন্ধুদের মধ্যে তার সঙ্গেই মন মজেছিল। অথচ এক স্কুলে পড়তাম না। শুধু এক ক্লাশে।

—তা' পরিচয় হল কি করে?

—আরে রাণীগঞ্জের সহর। সেতো আর তোমার কলকাতার মত মানুষের কারখানা নয়। ছোট্ট জায়গা। সবাই সবাইকে চিনে

ফেলে। তাছাড়া থাকতাম পাশাপাশি। আমি হোস্টেলে আর ও দাদামশায়ের বাড়ি।

—শৈলজা এখন কি করে ?

—শর্টহ্যাণ্ড, টাইপরাইটিং শেখে বাগবাজার কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে। কিন্তু কিছু হবে না !

—তাও তুমি এরমধ্যে বুঝে ফেলছ ? আমি বললাম।

—বুঝব না ! যে ছেলে খালি প্রেমের কবিতা লেখে, কল টিপে ইংরেজি হরফ সাজানোর কাজে তার হাত পাকাতে পারে কখনো ?

—প্রেমের কবিতা লেখে ? তা'হলে তো তার সঙ্গে আমার আলাপ করতে হচ্ছে।

—সবুর কর। সেও আসবে এখানে একটু বাদেই।

—তাকে মেস ছাড়া করলে কি রকম, সে কথা ত' বললে না !

—আগে থেকেই কথা ছিল, শৈলজার মেসে এসে উঠব। হাওড়া স্টেশন থেকে শৈলজা সঙ্গে করে নিয়ে এল বাদুরবাগানের মেসে। এখানে আমার অট্টহাসি আর উৎকট গানে এমনিতেই ত বাসিন্দারা একবেলাতেই ক্ষেপে আগুন হয়ে গেছে। তারপর শৈলজা 'নুরু নুরু' বলে ডাকছে আমায়। তারা আমার নাড়ি-নক্ষত্রের খোঁজ নিতে শুরু করে দিল। দুপুরবেলা ত' এক পংক্তিতে খেয়ে ওদের জাত মেরে দিলাম। তারপর যখন ওরা আবিষ্কার করল, আমি মুসলমান তখন এদের মেজাজ যা হল, তাত বুঝতেই পার। দল বেঁধে ঘর চড়াও হ'ল। রুচিবোধের সীমা ছেড়ে কোরাস কণ্ঠে বলে উঠল : আপনি মশায় মুখুজ্জ্যে বামুনের ছেলে হয়ে নেড়ের কাছে বোন বিয়ে দিতে পারেন, আমরা কিছু বলব না। কিন্তু জেনে শুনে আপনি আমাদের জাতধর্ম নষ্ট করছেন। এরজন্য আপনাকে কি করা উচিত জানেন ?

নির্বিকারভাবে শৈলজা উত্তর দিল : না।

—আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা এই মুহূর্তে মেস থেকে, ঘুঁষি পাকিয়ে দাবি জানাল মেসের বাসিন্দারা।

—তা' হলেই কি আপনারা খুশি হন? গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল শৈলজা।

—খুশি কি? যেতেই হবে আপনাকে, আর তা এই মুহূর্তেই।

—জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার সময়টুকু দেবেন ত? কিছুই যেন হয়নি। শৈলজার কথার সুরে এমনি ভাব।

—রিক্সা চড়ে যখন বাক্স বিছানা নিয়ে দু'জন বেরিয়ে পড়লাম তখন পর্যন্ত আমাদের গন্তব্যস্থান ঠিক নেই।

—কোথায় যাচ্ছি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—চল এক জায়গায় ভিড়ে যাব!

—আমি বুঝতে পারলাম, নজরুল বলে চলে, আমাকে নিয়ে শৈলজার মুস্কিল আছে। তাই আমি চলে এলাম এখানে। শৈলজা গেল তার দাদামশায়ের বাড়ি।···

এমন সময় কোঁকড়ানো বাবরি চুল, গোঁফ ওঠা পাঞ্জাবি গায়ে একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকল।

এই শৈলজা, নজরুল পরিচয় করিয়ে দিলে আমাকে। আর এই পবিত্র গাঙ্গুলি।···

—আপনিও ত' কবিতা লেখেন? শৈলজাকে প্রশ্ন করলাম। বলছিল নজরুল, তাও নাকি প্রেমের কবিতা?

—তাইত সবাই ধরে নিয়েছে কিছু হবে না তোর, বললে নজরুল। আমি ত নিশ্চিন্ত।

—নাইবা হলরে ভাই। কি হবে আর কি হচ্ছে না হচ্ছে—তাই নিয়ে মাথা ঘামাই না। তার চেয়ে নুরু একটা গান গা না। বলতে দেরী সইল না! হারমনিয়ামটা টেনে নিয়ে নজরুল শুরু করে দিল:

'দারুণ অগ্নি বানেরে
হৃদয় তৃষায় হাসে'···

ঘর কাঁপিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে গেয়ে চলল নজরুল। প্রতিটি কথা স্পষ্ট। জোর করে উচ্চারণ করছে, যেন সুরের তলায়

কথা চাপা না পড়ে। কিন্তু সব শেষে যখন গাইছে 'ভয় নাহি ভয় নাহি' তখন সুর উঠেছে সপ্তমে, সকল ভয় যেন অপসারিত করতে চাইছে সব দিক থেকে। শুধু খর চৈত্রের অগ্নিবাণের ভয় বিদূরণ করতে কেউ অতখানি উদাত্ত হয়ে উঠতে পারে না। তার সেই সুর এবং উচ্চারণের মধ্যে সর্বযুগের সর্বভয়হারা আশ্বাসবাণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। সবাইকে ডেকে বলছে, মাভৈঃ !

* * *

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলার ঘর। নিয়মিত সেখানে বসে সান্ধ্য মজলিশ। সাহিত্য-শিল্প সঙ্গীত—রাজনীতি কোন বিষয়ই আলোচনার বাইরে থাকে না। আসরে আসেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মোজাম্মেল হক, শৈলজানন্দ, গোলাম মোস্তাফা সহ বিভিন্ন সাহিত্যিক-শিল্পী। এতদিন নজরুল যাদের কাগজে কলমে চিনতেন, এবার তাঁরা কাছাকাছি, পাশাপাশি। গান-আবৃত্তি আর রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় ওঠে বন্ধুদের মধ্যে। কমবেশী সকলেই বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। স্বদেশের স্বাধীনতার পথ ও মত নিয়ে ক্রমে আলোচনার গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। সাহিত্য-শিল্পে তখন স্বাদেশিকতার তীব্র চেতনাবোধ। বিক্ষোভের বারুদ অগ্নিস্পর্শের অপেক্ষায় মাত্র।

এমনি একদিন ঐ সাহিত্যের আসরে হঠাৎ শোক-দুঃখ এবং ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল। খবর এল, দেশনেতা বালগঙ্গাধর তিলক বিগত হয়েছেন। তারিখটা ১৯২০ সালের ৩১ জুলাই।

সাহিত্যের মজলিশ শোকে মুহ্যমান। মজলিশের সকল সাহিত্যিক-শিল্পীর চোখের সামনে খবরের কাগজের একটি সংবাদ মুহূর্তেই ভেসে উঠল। মাত্র এক বছর আগে, অর্থাৎ ১৯১৯ সালের ৩ জুন তারিখের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত তদানীন্তন ভাইসরয়ের উদ্দেশে লেখা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একখানি খোলা চিঠি ছিল : হতভাগ্য জনগণকে যে নৃশংসভাবে শাস্তি দেওয়া হয়েছে,

প্রচীন ও আধুনিক কোন সভ্য শাসন-ব্যবস্থায় তার কোন জোড়া নেই।...

...সরকারী সম্মানের প্রতীক আজ জাতীয় অসম্মানের মধ্যে আমাদের লজ্জাকেই প্রকট করে তুলেছে। তথাকথিত নগণ্যতার অপরাধে আমার যে দেশবাসীকে অসহ্য অপমান সহ্য করতে হচ্ছে, সমস্ত বিশেষ-সম্মান বর্জিত হয়ে তাদেরই পাশে এসে আমি দাঁড়াতে চাই।...

বলাবাহুল্য, পাঞ্জাবের জালিওয়ানাবাগে ইংরেজ-সেনাপতি কুখ্যাত ডায়ার সাহেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র এবং সাজোয়া বাহিনীর বর্বরোচিত আক্রমণে নিরপরাধ যে অসংখ্য দেশবাসীর প্রাণ হরণ করা হয়, তার প্রতিবাদেই কবিগুরু ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট খেতাব' বর্জন করে ঐ খোলা চিঠিখানি প্রকাশ করেন। অপরাধ? রাউলট আইন এবং দেশনেতা গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের সাধারণ মানুষ জালিওয়ানাবাগে জমায়েত হয়েছিলেন। তাই তাদের শায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ সরকারের ঐ নৃশংস অভিযান!

সাহিত্যের মজলিশে-বসা সকলেই ক্ষুব্ধ—ব্যথিত। এক বছরের মধ্যে দুইটি শোক। জালিওয়ানাবাগে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড, আর দেশনেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের অকাল প্রয়াণ।

নজরুল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মজলিশের সকল সতীর্থই অবাক বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে। বুঝলেন, নজরুল হয়তো কিছু বলতে চাইছে, অথবা কোন যন্ত্রণায় তাঁর বুকের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে। সকলের চোখের সামনে কবি ঘরের বাইরে চলে গেলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে। আকাশে বাঁকা তলোয়ারের মত একাদশীর চাঁদ। কবিগুরুর খোলা চিঠির বয়ান তাঁর মনকে হয়তো উতল করে থাকবে। প্রতিবাদ—প্রতিরোধ অথবা নতুন কিছুর প্রত্যাশায় কবি নজরুল উত্তেজিত। নিস্তব্ধ—নীরব কবি এবার সকলের চমক ভাঙলেন। দীপ্তকণ্ঠে তিনি আবৃত্তি শুরু করলেন:

গোলামীর চেয়ে শহীদি-দর্জা
অনেক উর্দ্ধে জেনো
চাপরাশির ঐ তকমার চেয়ে
তলোয়ার বড় মেনো।
গোলামের ফুলদানীতে যদি এ
মুকুলের ঠাঁই হয়,
আল্লার কৃপা-বঞ্চিত হব
পাব মোরা পরাজয়!

নজরুল তখন বাইশ বছরের জওয়ান। করাচির সেনা-শিবির থেকে সদ্য-আসা নজরুলের মনে পরাধীনতার গ্লানি দারুণ আঘাত হানল। তাঁর মনে ঝড় উঠল। সে ঝড় বিপ্লবের ঝড়, সংগ্রামের ঝড়। সে সংগ্রাম স্বাধীনতার।

মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী তখনও মহাত্মা গান্ধী হননি। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সবে তাঁর উদয়। উদীয়মান সূর্য মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী। জালিওয়ানাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সন্ধিপত্রে তুরস্কের প্রতি ইংরেজ শক্তির দুর্ব্যবহারে গান্ধীও ক্ষুব্ধ হলেন। তাই তিনি তাঁর ক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জানাতে তদানীন্তন ভারতের বড়লাট 'চেমস্‌ফোর্ডকে' এক চিঠিতে লিখলেন: ভারতসরকার তার অধীনস্থ প্রজাদের সম্পর্কে এমন অসহনীয় ঔদাসীন্য দেখিয়েছে যে, আবেদন-নিবেদনের গতানুগতিক আন্দোলনে তার মধ্যে অনুশোচনা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।···ঐ পত্রের সঙ্গে গান্ধীজী ইংরেজের দেওয়া একটি সম্মানসূচক-পদকও ফেরৎ পাঠালেন। জুল এবং বুয়র যুদ্ধে গান্ধীর সেবাকার্যে মুগ্ধ হয়ে বিদেশী ইংরেজ সরকার এক সময় তাঁকে সম্মানসূচক ঐ পদকে ভূষিত করেছিল।

গান্ধীজীর ঐ চরমপত্র এবং পদক ফেরৎ পেয়ে ইংরেজ সরকার চমকে উঠল। সন্দিগ্ধ ইংরেজ প্রশাসন সন্দেহের জাল সারা দেশে ছড়িয়ে ফেলল। গান্ধীজী বুঝলেন, গায়ের জোরে বিরাট শক্তিধর সাম্রাজ্যবাদ শক্তির সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। তার জন্য চাই

নৈতিক এবং মানসিক বল। তাই তিনি নতুন পথের কথা চিন্তা করলেন। তাঁর ভাবনায় এল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কথা অত্যাচার-উৎপীড়ন আর শোক দুঃখ-ক্ষোভের মধ্য দিয়ে এক নতুন যুগের সুযোগ দেখা দিল।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর। কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ আধিবেশন বসল। সারাদেশের নেতারা সকলে জড়ো হলেন বিদেশী শাসকদের বেপরোয়া দমননীতির প্রতিবাদে সারাদেশ সোচ্চার।

কংগ্রেস-অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা তাঁদের বক্তব্য রাখলেন। তাতে ভরা ক্ষোভ আর প্রতিবাদের আগুন। তারপর গান্ধীজী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন: শুধুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেই আন্দোলন শেষ হবে না। তার জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী সক্রিয় আন্দোলন। তিনি প্রস্তাব তুললেন: বিদেশী পণ্য বর্জন কর। বিদেশী শাসকদের সঙ্গে চাই সর্বতোভাবে অসহযোগ আন্দোলন!…

গান্ধীজীর ঐ ডাকে সারাভারত জেগে উঠল। একটা নতুন আবেগের ঢেউ মুহূর্তেই এসে যেন দেশের প্রতিটি প্রান্ত প্লাবিত করল। মাত্র ছয় মাস আগে নজরুল ফিরেছেন সমর শিবির থেকে। মহাত্মজীর ঐ আহ্বান কবি নজরুলের অন্তরেও চেতনায় ঢেউ তুলল। তরুণ কবি নজরুল অন্ধকারের শেষে প্রহরের স্বপ্ন দেখলেন। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় গান্ধীজীর ঐ অসহযোগ আন্দোলনে বিদেশী শাসকের মূল বনিয়াদে নাড়া পড়বে। বিদ্রোহীর লেখনী মুখর হল। তিনি লিখলেন:

এবার মহানিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে, করুণ বেশে।
আলো তার ভরবে এবার ঘর—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !!…

কবির কবিতায় সুর হল। পথে পথে গান! স্বদেশী করা মানুষের মুখে মুখে ঐ সুর। যেন ভয়-ভীতি, সঙ্কোচ দূর করার অভয় মন্ত্র!

সাগর পারের ইংরেজ শাসকরা এ দেশের মাটিতে যে শাসন

শোষণ করছিল, তাও সরল-সহজ ভাষায় কবি নজরুল সাধারণ চাষীর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে কসুর করলেন না। গান্ধীজীর দূত হয়ে কবি তাই লিখলেন :

তোর গায়ের মাঠে রবির ফসল ছবির মত লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার আগে নুন লঙ্কা মাগে ?
তোর তরকারীতেও সরকারী কোন্ ট্যাক্স বুঝি বসে !
তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষু জলের রসে ?

কবির ঐ কবিতা গ্রামের চাষাভূষার মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঘরে ঘরে, মাঠে-খামারে তারা সুর ভাজে, আর আবৃত্তি করে নজরুলের ঐ কবিতা, কবিতা আবৃত্তি করে আর নিজের অজান্তে তারা গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে দেয় গান্ধাজীর মূল বক্তব্য !

শুধু কি তাই ? কবি ক্রমে সাগর পারের ইংরেজ লুঠেরাদের সম্বন্ধে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন :

পরের মুলুক লুঠ করে খায়
ডাকাত আর ডাকাত—
তাদের তরে বরাদ্দ ভাই
আঘাত, শুধু আঘাত।

যুদ্ধফেরৎ হাবিলদার কবি নজরুল এবার চারণ কবি হলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। দেশের প্রতি প্রান্তে মানুষের মুখে মুখে নজরুলের লেখা স্বদেশী গান। চারদিকে তাই নজরুলের আমন্ত্রণ। কোথায় ঢাকা, কোথায় কুমিল্লা, আর কোথায় বা দৌলতপুর। অসহযোগ-আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কবি তখন ক্লান্তিহীন পথিক, চারণ কবি। কখনও স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, আবার কখনও হারমোনিয়ম নিয়ে উচ্চকণ্ঠে কোরাস !

১৯২১ সাল।

সারা ভারতে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন। শাসন-শোষণ মুক্ত স্বদেশী সরকার গঠনের স্বপ্নে, পরাধীন জাতি

বিভোর। সেই চরম মুহূর্তে খবর এল : ইংলণ্ডের এক রাজপুত্র, প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণে আসছেন। এ খবরে সমস্ত দেশের অন্তরাত্মা ক্ষোভ আর ঘৃণায় জ্বলে উঠল।

নভেম্বরের ২১ তারিখ। জাতীয় কংগ্রেস নির্দ্দেশ দিলেন : সারাদেশে হরতাল পালন করো। ইংরেজ প্রতিনিধি প্রিন্স অফ ওয়েলসকে পরাধীন ভারত স্বাগত জানাবে না। জানাবে প্রতিবাদ।

দেশের প্রত্যেক প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল ঐ আওয়াজ। তৈরি হল প্রতিবাদ মিছিল। সুদূর কুমিল্লা থেকে নজরুলের ডাক এল : কুমিল্লার মানুষ আপনাকে তাদের সংগ্রামের সাথী করতে চায়।

নজরুলের ক্লান্তি নেই। ঘর ছাড়া বাঁধনহারা পাখি। নিত্য নতুন সুর তুলতেই তাঁর আনন্দ, ছুটলেন কুমিল্লার উদ্দেশে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে গলায় হারমনিয়ম ঝুলিয়ে স্বদেশীকরা জনতার সামনের সারিতে নজরুল। সহরের পথে পথে তিনি স্বরচিত গানের সুর তুললেন :

ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
জাগো, জাগো,
তন্দ্রা অলস জাগো গো—
জাগরে! জাগরে॥

অসহযোগ-আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে গান্ধীজী বললেন : ঘরে ঘরে চরকা চালাও, সুতা কাটো। স্বাবলম্বী হও। আর বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভর নয়। দেশের অর্থ দেশে থাকবে। ঘরে ঘরে চাই চরকা, আর চরকা।

গান্ধীজীর আহ্বান নজরুলের কলমে দোলা দিল। কবি লিখলেন :

ঘোর—

ঘোররে ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর,
(ঐ) স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর
তোর ঘোরার শব্দে ভাই,
সদাই শুনতে পাই

(ঐ) খুলল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আসল ভারত-ভাগ্য-রবি কাটল দুখের রাত্রি ঘোর॥

অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অভিযোগে সারাদেশের নেতাদের গ্রেপ্তার করা শুরু হল। ইংরেজ-শাসক প্রথম শ্রেণীর নেতাদের লৌহকারার অন্তরালে রেখে জাগ্রত জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইল। প্রতিদিন বিভিন্ন নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর আসে। অবশেষে একদিন খবর এল : গান্ধীজীর একান্ত অনুগামী জনপ্রিয় আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কারাগারে রেখেছে। সারাদেশে এবার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি উঠল। সভা-শোভাযাত্রা! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তরুণ কবি নজরুল চ্যালেঞ্জ করলেন :

জাগেন সত্য ভগবান যেরে
আমাদেরি এই বক্ষমাঝ—
আল্লার গলে কে দেবে শিকল,
দেখে নেব মোরা তাহাই আজ॥

দিন যায়। তারপর কয়েক মাস। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম সারির সকল নেতাই প্রায় ইংরেজের কারাগারে। দেশের মানুষ নেতৃত্বহীন। কলকাতা ছেড়ে সুদূর কুমিল্লায় বসে কবির মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দেয়। দেখলেন, মহাত্মাজীর অহিংস অসহযোগে বৃটিশ-সিংহের প্রতাপ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, বরং সারাদেশে তারা অত্যাচার-উৎপীড়নের মাত্রা আরও বাড়িয়ে চলেছে। প্রতিদিন আসে নিত্য নতুন খবর। কারার অভ্যন্তরে বন্দীদের উপর চলছে নির্মম

অত্যাচার। কবির সমস্ত পৌরুষ মুহূর্তেই দাবানলের মত জ্বলে উঠল। বললেন: চাই প্রতিবাদ, প্রতিকার, প্রতিরোধ।

এবার অহিংস আন্দোলন কবির কাছে অর্থহীন মনে হল। ঠিক ঐ সময় তিনি সংবাদ পেলেন, অহিংস-অসহযোগ নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেও দ্বন্দ্ব দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

ওদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের মধ্যে আরেকটি উপদল তৈরি করেছেন! তার নাম 'স্বরাজ্যদল'। মতিলাল নেহেরু দেশবন্ধুর অন্যতম সহায়ক। সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধু তাঁর সঙ্গী করে নিয়েছেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে দেশবন্ধু সভাসমিতি করছেন।

নজরুল যেন এবার আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন! এতদিনের পুরানো চিন্তা-ভাবনায় ছেদ ঘটল। তিনি বুঝলেন, বৈপ্লবিক আন্দোলন ছাড়া পশুশক্তির সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব। শুধুমাত্র চরকা কেটে দেশের মানুষকে আটকে রাখলে আর চলবে না, চাই পৌরুষ, চাই শক্তি-সাহস আর মৃত্যু জয়ের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। তাই তিনি লিখলেন:

সুতা কেটে মোরা স্বাধীনতা চাই,
বসে বসে কাল গুণি।
জাগোরে জোয়ান! হাত ধরে গেল,
মিথ্যার তাঁত বুনি!

কুমিল্লা সহরে প্রায় ছয়মাস কাটিয়ে নজরুল কলকাতা ফিরলেন। তাঁর মনে তখন মহাসমুদ্রের আকাঙ্ক্ষা। মেঘনা-পদ্মার জল পার হয়ে তাই কবি এবার মোহনার পথে যাত্রা করলেন।

১৯২১ সালের ১০ ডিসেম্বর। ঐদিন বাংলার জননেতা দেশবন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। অপরাধ: স্বদেশী আন্দোলন করে দেশের মানুষকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্র শোনাচ্ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঐ সময় 'বাঙ্গলার কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ সম্পাদনা করছিলেন। তাঁর অবর্তমানে ঐ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দেশবন্ধু-জায়া বাসন্তী দেবীর ওপর পড়ল।

কবি নজরুল তখন বাংলার ঘরে ঘরে একটি সুপরিচিত নাম। বাসন্তী দেবী বোধহয় নজরুলের রচনায় আগুনের উত্তাপ খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি পত্রিকার দায়িত্ব নিয়েই তাঁর এক নিকট আত্মীয় সুকুমাররঞ্জন দাশকে নজরুলের সন্ধানে পাঠান। সঙ্গে অবশ্য তিনি নজরুল ইসলামকে মৌখিক আমন্ত্রণও জানালেন।

কবি ঐ আমন্ত্রণ পেয়ে মহা খুশি। বাসন্তী দেবীর অনুরোধ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কবি কালি আর কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। পাশেই বসে সুকুমারবাবু আর মুজফ্‌ফর আহমদ। মুজফ্‌ফর সাহেব ঐ প্রসঙ্গে লিখেছেন :...অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই কবিতা লেখা শুরু করে দিল। সুকুমাররঞ্জন আর আমি খুব আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর কবিতাটি লেখা শেষ করে নজরুল তা' আমাদের পড়ে শোনাল।

নজরুলেরই ঐ কবিতার নাম ছিল 'ভাঙার গান'। ইংরেজের কারাগারে রাজবন্দীদের উদ্দেশে লেখা ঐ কবিতাখানি 'বাঙ্গলার কথা'র ২০শে জানুয়ারি তারিখে (১৯২২) প্রকাশিত হল। কবি লিখলেন :

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল, কররে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল-পূজার পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।...

* * *

নাচে ঐ কাল বোশেখী
কাটাবি কাল বসে কি?

দে'রে দেখি
ভীম ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার, ভাঙরে তালা !
যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি !...

'ভাঙার গান' লিখে কবি সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী দেবীর কাছে তা' পাঠিয়ে দিলেন। কবিতাটি প্রকাশের পর ইংরেজ শাসক ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। বলাবহুল্য, কিছুদিনের মধ্যেই ত্রস্ত ইংরেজ সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করল।

কবিতা পাঠানোর কিছুদিন পর কবি নজরুল বাসন্তী দেবীর কাছে যান এবং তাঁর বাড়িতে খাওয়া দওয়াও করেন। বাসন্তী দেবী নজরুলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। জেল থেকে ফিরে এসে দেশবন্ধুও তরুণ কবিকে কাছে টেনে নিলেন। নজরুলও দেশবন্ধুর কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া করতেন। ঐ সময়ই একদিন দেশবন্ধুর বাসভবনে তরুণ কবির সঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয়। বিপ্লবের আদর্শে উদ্দীপ্ত তরুণ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আগে থেকেই কবির পরিচয় হয়েছিল। এবং বলাবাহুল্য, দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক চেতনা কাজী নজরুলকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তায় ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

১৯২১ সাল। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। সঠিক তারিখ এখনও অজ্ঞাত। তখন নজরুল থাকতেন মধ্য কলকাতার তালতলা লেনের এক বাড়িতে। মুজফ্ফর আহমদ আর নজরুল ইসলাম দুই বন্ধু একই সঙ্গে থাকতেন। মুজফ্ফর সাহেব সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন। নজরুল তখনও জেগে।

পরদিন খুব ভোরে নজরুল ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। তারপর বন্ধুবরকে কাছে ডেকে নিলেন। আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল তাঁর চোখ

মুখ। বললেন : গতরাত্রে তুমি যখন ঘুমে মগ্ন, তখন আমি এক দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছি।

বন্ধু মুজফ্‌ফর সাহেব কবিকে জানতেন। কথায় কথায় কবিতা আর গান। যখন যা খুশি। তাই খুব একটা বিস্মিত হলেন না। কবি তাঁর সদ্য রচিত কবিতাখানি বন্ধুকে শোনানোর জন্য আবৃত্তি শুরু করলেন।

আবেগ-মথিত কবি-কণ্ঠে ধ্বনিত হল ঐকিহাসিক কবিতা :

বল বীর—
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি আকার, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের আকাশ ফাড়ি'
চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ছাড়ি
ভূলোক-দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি বিশ্ববিধাত্রীর।
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে
রাজ-রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

তখন যেন কবি সত্য সত্যই এক বিদ্রোহী। চোখে মুখে তাঁর বিদ্রোহের ছাপ।

নজরুল রাত জেগে যখন বিদ্রোহী কবিতা রচনা করেন, তখন তিনি তা, পেন্সিলে লিখেছিলেন। তখনকার দিনে ঝরণা কলম বা ফাউণ্টেন পেন ছিল না। বারংবার দোয়াত কলম ডোবাতে গেলে পাছে ভাব-ভাষার সাবলিল গতি ক্ষুন্ন হয়, সেই আশঙ্কায় পেন্সিলেই ঐ বিখ্যাত কবিতা লিখেছিলেন। নজরুলের বিখ্যাত ঐ বিদ্রোহী কবিতার প্রথম পাঠক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। ঐ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :…বিদ্রোহী কবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা নজরুল তার

জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আমাকেই প্রথম পড়ে শোনাল। অথচ আমার স্বভাবের দোষে তাকে না পারলাম বাহ্‌বা দিতে, না পারলাম একটুও উচ্ছ্বসিত হতে।...আমার স্বভাবটা যদিও নজরুলের অজানা ছিল না, তবুও সে মনে মনে আহত যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিলেন।...

নজরুলের ঐ কবিতাটি সৃষ্টির পেছনের ইতিহাস কী সঠিক করে কেউ তা বলতে পারেন না। তার একটা কথা এখানে উল্লেখ্য, কবি নজরুল ততদিনে অহিংস-অসহযোগের আদর্শে আস্থা হারিয়েছেন। তখন কবি যেমন দেশবন্ধু-সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি, তেমনি আবার মাণিকতলার বোমার মামলার আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন। বিপ্লবীদেরই অন্যতম নায়ক ইংরেজ শাসকদের চক্ষুশূল বিপ্লবী অবিনাশ চন্দ্র তখন বিজলী পত্রিকার ম্যানেজার। শোনা যায় ঐ দিন সকালেই অবিনাশ বাবু নজরুলের কাছে আসেন। অবিনাশবাবুকে দেখেই কবি বলে ওঠেন: অবিনাশদা, বিরাট এক কবিতা লিখে ফেলেছি।

অবিনাশবাবুকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই কবি স্বয়ং বিদ্রোহী কবিতার আবৃত্তি শুরু করলেন। বিদ্রোহী কবির মুখে বিদ্রোহীর আবৃত্তি শুনে চরম বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র মুগ্ধ। তাঁর সমস্ত শিরা উপশিরায়ও যেন রক্তের দোলা লাগল। অবিনাশবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। কবির কাছ থেকে ঐ কবিতা নিয়ে গেলেন। তারপর ৬ জানুয়ারি [১৯২২] শুক্রবার বিজলীর পাতায় জ্বল-জ্বল করে উঠল বিদ্রোহী কবির ঐতিহাসিক সৃষ্টি বিদ্রোহী কবিতা।

মুজফ্‌ফর সাহের নিজে লিখেছেন, বিদ্রোহী কবিতা আনতে অবিনাশবাবু তালতলা লেনের বাড়িতে নজরুলের কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু অবিনাশবাবুর বক্তব্য অবশ্য অন্য তথ্য প্রকাশ করে। সঙ্গে অবশ্য আরেক ইতিহাসও তিনি তুলে ধরেন। তিনি লিখেছেন:

…তাঁকে (নজরুলকে) বিজলীতে একটা কবিতা বা কোন প্রবন্ধ লেখার কথা বলি। সে একটা কবিতা লিখে দু'চারদিনের মধ্যে আনবে বলে। তিন চারদিন পরে টুকরো টুকরো এক গোছা কাগজে নম্বর দিয়ে, পেন্সিলে লেখা একটা কবিতা নিয়ে এসে বলল: অবিনাশদা, শোন! অঙ্গভঙ্গী করে সে কবিতাটি পড়ল।

'ওরকম টুকরো কাগজে লেখা কবিতা হারিয়ে যেতে পারে, পেন্সিলে লেখা নষ্টও হয়ে যেতে পারে, তুমি বলে যাও আমি কালি দিয়ে ভাল করে লিখে নিই।'

খুশি হয়ে কাজী বলল: সেই ভাল। তুমি লিখে নাও অবিনাশদা। …লেখা শেষ হয়ে গেলে নামকরণ করা হল 'বিদ্রোহী'। আমাদের প্রেসের প্রিন্টারকে ডেকে কাগজগুলি তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, কালকের বিজলীতে এইগুলি বার করতে হবে। যত সত্বর সম্ভব এর একটা প্রুফ পাঠিয়ে দিন।…

পরের দিন সকালে এসে কবি চারখানা বিজলী নিয়ে গেল। বললে, গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।—

'বেশ ফিরে এসে বলো তিনি দেখে কি বললেন'।

বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তাঁর বাড়ি গিয়ে 'গুরুজী গুরুজী' বলে চেঁচাতে থাকে। উপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন: কী কাজী অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন, কী হয়েছে?

আপনাকে হত্যা করবো গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।

—হত্যা করবো, হত্যা করবো কি। এস ওপরে এসে বোস।

—হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আপনাকে হত্যা করবো। বসুন, শুনুন।

কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিজলী হাতে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিদ্রোহী কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো। তিনি স্তব্ধ বিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন: হ্যাঁ কাজী তুমি আমায় সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার

কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার কবি প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

'বিদ্রোহী'র কবি নজরুল বিশ্বকবির ঐ আশীর্বাদ সেদিন মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। সগর্বে তিনি ফিরে এসেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির আঙিনা থেকে এবং সত্যসত্যই তারপর থেকেই 'বিদ্রোহী'র কবি বিদ্রোহী কবি। ঘরে ঘরে তাঁর নাম, তাঁর গান আর তাঁর সুর। মাঠে-ময়দানে, সংঘ সংগঠনে, রাজনীতির মঞ্চে আর বিদ্যায়তনে বিদ্রোহী কবির তখন অবাধ গতি। মুখে মুখে শুধু এক নাম, সে নাম বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম। তিনি বিপ্লবীদেরও তখন প্রেরণার উৎস!

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল সাপ্তাহিক ধূমকেতু প্রকাশে ব্রতী হলেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ১৯২২ সালের ১২ আগস্ট। ধূমকেতুর সম্পাদকরূপে 'সারথি' নাম ছাপা হল। বিদ্রোহী কবিরই ছদ্মনাম। পত্রিকার কর্মসচিব শান্তিপদ সিংহ আর মুদ্রাকর প্রকাশক আফজালুম হক। ৩২ কলেজ-স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত ধূমকেতুর উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে সারথি নজরুল লিখলেন : মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে জয় প্রলয়ঙ্কর বলে ধূমকেতুকে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হ'ল! আমার কর্ণধার আমি! আমার পথ দেখাবে আমার মত। আমার যাত্রা শুরুর আগে আমি সালাম জানাচ্ছি—নমস্কার জানাচ্ছি আমার সত্যকে।...

দু'মাসের মাথায় অক্টোবরের ১৩ তারিখে ধূমকেতুর সম্পাদকীয়-স্তম্ভে তিনি লেখেন :...পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।

আর বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, "আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!" বলতে হবে, 'যে যায় যাক সে আমার হয় নি লয়।' কথাটা শুনতে হয়ত একটু বড় রকমের হয়ে গেল। একটু সহজ করে বলবার চেষ্টা করি। আর এইটাই ধূমকেতুর সবচেয়ে বড় বলা :—

আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশী বুঝবার ভান করে যেন শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মত হোক, আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত হোক। আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বানে ঠিক ততটুকু মানব। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে তবে মানবো না। এবং এই 'মানি না' কথাটা সকলের কাছে মাথা উঁচু করে স্বীকার করতে হবে। এতে হয়ত লোকের অনেক নিন্দা, বদনাম, অপবাদ শুনতে হবে, কিন্তু আমি আমার কাছে ঠিক থাকব। তাঁদের বা তাঁদের মত ঠিক না বুঝেও যদি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে আমি গান্ধী ভক্ত বা অরবিন্দ ভক্ত তাতে অনেকের শ্রদ্ধা, প্রশংসা লাভ করব, কিন্তু আসলে তো সেটা ফাঁকি দিয়ে নেওয়া। এতে অন্যকে প্রবঞ্চনা করে মুখে বাহবা নিতে পারি কিন্তু আমার অন্তরের দেবতা অর্থাৎ আমার আমি তো দিনদিন ক্লিষ্ট ও পীড়িতই হয়ে উঠবে। অন্যায় করলে, পাপ করলে অন্তরে যে পীড়া উপস্থিত হয়, মানুষের সেইটুকুই ভগবান। সেইটুকুই সত্য। সকলের অন্তরে এমন একটা কিছু আছে যেটা মিথ্যা সইতে পারে না। তা নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। সেটাকে সব সময় হয়ত জিদের বশে স্বীকার করি না কিন্তু নিজেকে তো আর ফাঁকি দেওয়া চলে না। যখন ফাঁকি দিয়ে লোকের কাছ থেকে বাহবা নিয়ে ফিরি, তখন আমার ঐ বাহবা অর্জনের ফাঁকিরা কথা মনে হলে প্রাণে যেন কেমন অসোয়াস্তি কাঁটার মত বিঁধতে থাকে। ঐ অসোয়াস্তি হচ্ছে অনুশোচনা বা অনুতাপ। যাকে সদা সর্বদা তার কৃতকর্মের বা হঠকারিতার জন্য এই রকম অনুশোচনা বা অনুতাপের

তুষানলে দগ্ধ হতে হয়, সে ক্রমেই ভীরু কাপুরুষ হয়ে যেতে থাকে। সে তখন বাকসর্বস্ব হয়ে উঠে ফোঁকরা ঢেঁকির মত। তাকে দিয়ে আর কোনদিন বড় কিছুর আশা করা যায় না। আমাদের সকলের মধ্যে নিরন্তর এই ফাঁকির লীলা চলেছে। এই বাঙলা হয়ে পড়েছে ফাঁকির বৃন্দাবন! কর্ম চাই সত্য কিন্তু কর্মে নামবার বা নামাবার এই শিক্ষাটুকু ছেলেদের বা বড়দের রীতিমত দিতে হবে যে, তারা যেন নিজেকে ফাঁকি দিতে না শেখে, আত্মপ্রবঞ্চনা করে করে নিজে-কেই পীড়িত করে না তোলে। আমি জীবনে অনেক আত্মপ্রবঞ্চনা করে অন্তরে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছি। কত রাত্রি অনুশোচনায় ঘুম হয় নাই। এখন সে-সব ভুল বুঝতে পেরেছি। এখন সোজা এই বুঝেছি যে, আমি যা ভাল বুঝি, আমি শুধু সেইটুকু প্রকাশ করব, বলে বেড়াব, লোকে নিন্দা যতই করুক, আর আমার কাছে ছোট হয়ে থাকব না। আত্মপ্রবঞ্চনা করে আর নির্যাতন ভোগ করব না।

যাঁকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, তাঁকে বুঝবার ভান করলে তাঁকে অপমানই করা হয়। কারণ, পূজা মানে দেবতাকে সত্যি করে চিনে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলী দেওয়া। যাঁকে আমি সত্যি করে বুঝতে পারি নি, তাঁকে পূজা করতে যাওয়া মানে তাঁকে অপমান করা। মিথ্যা মন্ত্রের উচ্চারণে দেবতা পীড়িতই হয়ে ওঠেন দিন দিন, প্রসাদ দেন না।

কিন্তু মানুষের এমনই দুর্বলতা যে এই শ্রদ্ধা প্রশংসা পাওয়ার লোভটুকুকে কিছুতেই সে জয় করতে পারছে না। সমাজে থেকে সমাজের শ্রদ্ধা লাভের জন্য তাকে জেনেশুনে অনেক মিথ্যা আচরণ করতে হয়। ধূমকেতু এখন এইটুকু প্রচার করতে চায় যে দেশ উদ্ধারের জন্য যারা সৈনিক হতে চায়, অন্তত: তারা যেন সর্বাগ্রে এই দুর্বলতা এই লোভটুকু জয় করবার ক্ষমতা অর্জন করে তবে কোনো কাজে নামে। সত্যিকারের প্রাণ না নিয়ে কাজে নামলে তাতে পণ্ডই হয় বেশী। অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংস

আন্দোলনে নেমেছিলেন কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না। আপনি সরে পড়লেন। রবীন্দ্র-অরবিন্দ ভক্তদের মধ্যেও ঐ একই প্রবঞ্চনা ফাঁকি এসে পড়েছে। এরা অন্ধ ভক্ত, চোখওয়ালা ভক্ত নয়, এরা বুঝেও বোঝে না যে পূজার নামে এরা তাঁদের অপমান করছে। বড় করবার নামে তাঁদের লোক চক্ষুতে আরো খাটোই করে তুলছে। এদের এতটুকু দুঃসাহস নেই যে, যেটুকু বুঝতে পারছে না সেটুকু বুঝতে পারছি না বলে বুঝে নিতে পাচ্ছে তাঁর গুরুর কাছে সে কম বুদ্ধিমান হয়ে পড়ে বা গুরুর রোষ দৃষ্টিতে পড়ে। এসব অন্ধ লোক দিয়ে কোনো কাজ হবে না। কেননা, অন্তরে মিথ্যা আর ফাঁকি নিয়ে কাজে নামলে কাজেও ফাঁকি পড়ে যায়। যাঁকে বুঝি না, যাঁর মত বুঝতে পারি না, তার মুখের সামনে মাথা উঁচু করে বলতে হবে যে, আপনার মত বুঝিতে পারছিনে বা আপনার এ মত এই, এই কারণে ভুল। তাতে যিনি সত্যিকার দেবতা তিনি কখনই রুষ্ট হবেন না। বরং তোমার সরলতা ও সত্যপ্রিয়তার দুঃসাহসিকতার জন্য শ্রদ্ধাই করবেন। বিদ্রোহ কাউকে না মানা নয়, বিদ্রোহ মানে যেটা বুঝি না সেটাকে মাথা উঁচু করে 'বুঝি না' বলা। যে লোক তার নিজের জন্য নিজের কাছে লজ্জিত নয়, সে ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে স্বর্গের পথে উঠে চলবেই চলবে। আর যাকে পদে পদে ফাঁকি আর মিথ্যার জন্য কুণ্ঠিত হয়ে চলতে হয় সে ক্রমেই নীচের দিকে নামতে থাকে এইটাই নরক যন্ত্রণা। আমার বিশ্বাস, আত্মার তৃপ্তিই স্বর্গসুখ আর আত্মপ্রবঞ্চনার পীড়াই নরক-যন্ত্রণা। ধূমকেতুর মত হচ্ছে এই যে, তোমার মন যা চায় তাই কর।

ধর্ম, সমাজ, রাজা, দেবতা কাউকে মেনো না, নিজের মনের শাসন মেনে চল। গান্ধীর মত যদি প্রাণ থেকে মানতে না পার, ব্যস, লোকের নিন্দা বদনামের ভয়ে তা মেনো না। রবীন্দ্র-অরবিন্দের মত ঠিক মেনে নিতে পারছ না, ব্যস্ মাথা উঁচু করে বল, 'বুঝতে পারছি না'। অন্ধ ভক্তির অন্ধতায় যা বোঝো না তা 'বুঝি না' বল, দেখবে

অপূর্ব তৃপ্তি পুলকে আত্মা তোমার কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তখন নিন্দা অপমান তোমার গায়ে লাগবে না। নিজে যতটুকু ভাল মনে কর—কর। তার চেয়ে মুক্তি আর নেই প্রাণের। ইংরেজের সহযোগিতা করে যদি দেশ উদ্ধার হবে বলে তুমি প্রাণ হতে নিজে ফাঁকি না দিয়ে বিশ্বাস কর তবে তাই কর, কারুর নিন্দা ও অপবাদকে ভয় করো না। কিংবা যদি তার বিদ্রোহ না করলে দেশের মুক্তি হবে না মনে কর তাই বল বুক ফুলিয়ে! অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তাতে আসে আসুক বাইরের নির্যাতন. ইংরেজের মার, তাতে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরো বেড়েই চলবে, মিথ্যাকে মিথ্যা বললে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বললে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয় তাতে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হয়ে ওঠে তখন নির্যাতনের আগুন ঐ আনন্দের এক ফুঁতে নিভে যায়। ইব্রাহিম যখন বিদ্রোহী হয়ে নমরুদের অত্যাচারকে অত্যাচার আর তার মিথ্যা বলে প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন, তখন নমরুদ তাঁকে ধরে এক বিরাট অগ্নি-জাহান্নামের সৃষ্টি করে তাতে নিক্ষেপ করলে। কিন্তু ইব্রাহিমের কোথাও ফাঁকি ছিল না বলে, সত্যে জোর ছিল বলে, আত্মপ্রসাদ ঐ বিপুল আনন্দের এক ফুঁতে সমস্ত জাহান্নাম ফুল হেসে উঠল। ইব্রাহিমের মনে যদি এতটুকু ফাঁকি থাকত, তবে তখনই আগুন তাকে ভস্মীভূত করে দিত।

ভগবানের বুকে লাথি মারবার অসমসাহসিকতা নিয়ে বেড়িয়ে-ছিল মহাবিদ্রোহী ভৃগু। কেননা সে তাঁকে বোঝে নি, তার ভুলকে ভুল বলে শোধরাবার চেষ্টা করেছিল। ভগবান যখন তা শুনলেন না, ঘুমিয়ে রইলেন, তখন ভৃগু ভগবানের বুকে লাথি মেরে জাগালেন। ভগবানও ভৃগুর পদচিহ্ন সগৌরবে বক্ষে ধারণ করলেন। ভাবতে চোখে জল আসে। কিন্তু ভগবানের যারা বিদ্রোহী নয়, গো-বেচারী ভক্ত, ভগবানকে প্রভু ভেবে জনম জনম কাটিয়ে দিলে সাধনায়, তাদের হয়ত সিদ্ধি তিনি দিলেন। কিন্তু তাদের কারুর পদাঘাতকে

ত্তো বুকে ধারণ করে দেখালেন না। এর আসল মানে হচ্ছে, সত্যকে জানবার যার বিপুল সত্য ইচ্ছা থাকে তাকে তার আঘাতও সত্য সহ্য করে, বুকে করে তার সত্যনিষ্ঠা, সত্যকে জাগাবার আকাঙ্ক্ষাকে জগতের ভীরু কাপুরুষ ভণ্ড ভক্তদের চোখের সামনে দেখায় যে, এই ফাঁকির পূজারীর ক্রন্দনে সত্য জাগে না। সত্যকে জাগাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শ্রদ্ধা প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।…

কবির ঐ ঘোষণায় সারাদেশ বিস্মিত। কেননা, ছাপার হরফে প্রকাশ্যে এধরনের বক্তব্য রাখা—এ ছিল তখনকার দিনে কল্পনারও অতীত। বিপ্লবীরা অবশ্য তখন ইশ্‌তাহার ছাপিয়ে বিলি করেছেন। কিন্তু তাতে কারুর নাম-ঠিকানা কিছুই থাকত না। গোপনে তা ছড়িয়ে দেওয়া হত। কিন্তু নজরুল বিদ্রোহী বিপ্লবী। প্রকাশ্যে তিনি তাই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরলেন।

১৯২২ সালে নজরুল যখন প্রকাশ্যে ঐ দাবি তুলে ধরলেন, দেশের অবিসম্বাদী নেতা-গান্ধীজীও তখন পর্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান নি। ও বছরই গান্ধীজী বলেছিলেন: 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' পেলেই তিনি বৃটিশের পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' উড়াবেন!

কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে অবশ্য মাওলানা হসরৎ মোহানী ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নিয়ে এক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল: The object of Indian National Congress is the attainment of Swaraj or Complete Independence free from all foriegn controll by the people of India…

গান্ধীজীর বিরোধীতায় অবশ্য ঐ প্রস্তাব আর কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে গৃহীত হতে পারেনি। বরং পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ঐ প্রস্তাব পেশ করার পর মাওলানা হসরৎ মোহানীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়।

সুতরাং ধূমকেতুর ছটায় নজরুলের ঐ বেপরোয়া বক্তব্য প্রকাশের পর চারদিকে যে সন্দেহের কানাকানি দেখা দেয়নি, তা নয়।

বিপ্লবীরা তাতে আনন্দিত হলেও, সাধারণ মানুষের আশঙ্কা ছিল : যে কোন মুহূর্তে নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উঠবে। নজরুল তা' জানতেন। এবং জেনে শুনেও সত্য ভাষণে সেদিন বিরত থাকেন নি।

শুধু সম্পাদকীয় স্তম্ভে কেন? কবিতার ছন্দেও নজরুল ধূমকেতুর পাতায় পাতায় বিপ্লবের বাণী ছড়িয়েছেন। অন্যায়ের প্রতীক খড়্গহস্ত দেবী কালীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা ধূমকেতুর পাতায় প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন :

রক্তাম্বরা পর মা এবার
জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেত বসন,
দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন
বাজে তরবারি ঝনক্-ঝন্!
সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেল মাগো,
জ্বাল সেথা জ্বাল সেথা কাল-চিতা—
তোমার খড়্গ-রক্ত হউক
স্রষ্টার বুকে লাল ফিতা।

* * *

টুঁটি টিপে মার অত্যাচারে মা
গল্-হারা হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার 'ধূমকেতু'-জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।...

একের পর এক চমক দিতে লাগল ধূমকেতু। যেমনি ভাষা, তেমনি ভাব। আর তার চেয়েও অনেক বেশি দেশ প্রেমের উত্তাপ। যে-উত্তাপ দেশবাসীর একঘেঁয়ে অলস-জীবনে নতুন ভাব—ভাবনার স্রোত বইয়ে দিল। তদানীন্তন কংগ্রেসের বিপ্লবী নেতা ভূপতি মজুমদার তো আর পেছিয়ে থাকতে পারলেন না। প্রকাশ্যে এসে তিনি নজরুলকে অভিনন্দিত করলেন এবং শুধু কায়িক শ্রম দিয়েই নয়, অর্থ দিয়েও নিয়মিত ধূমকেতু প্রকাশে সাহায্য করতে লাগলেন।

ধূমকেতু তখন বিপ্লবী বাংলার যুব ছাত্রদের প্রিয় পত্রিকা। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হুমায়ুন কবীর তখন প্রথম বা দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, তিনি ছুটে এলেন ধূমকেতুর নতুন স্বাদে আকৃষ্ট হয়ে। নজরুলের ধূমকেতুকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন বিপ্লবীদের আনাগোনা, তেমনি সাহিত্যিক-শিল্পীরও আবার মজলিস-জটলা। একদিন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এলেন ধূমকেতুর কবি নজরুলকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে। এমনিভাবে অনেক সাহিত্যিক শিল্পী আসা শুরু করলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে বাংলার সব সাহিত্যিক শিল্পীদের এক মিলন ক্ষেত্র হল ধূমকেতুর দপ্তর।

ধূমকেতুর দপ্তর ঐ সময় কলেজ স্ট্রীট থেকে ৭, প্রতাপ চ্যাটার্জ্জী স্ট্রীটে তুলে আনা হল। কেননা, স্থানাভাব। ধূমকেতুকে ঘিরে তখন উদীয়মান সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎ পণ্ডিত, মুজফ্‌ফর আহমদ, নলিনীকান্ত সরকার, আব্দুল হালিম প্রমুখ তৎকালীন বাংলার গুণী-জ্ঞানীর দলও।

বলা বাহুল্য, ধূমকেতু প্রকাশের পর থেকেই তার ওপর পুলিশের কড়া নজর ছিল। সাদা পোষাকের পুলিশ সবসময় যাতায়াত করত। ইংরেজ প্রশাসন আগে থেকেই টের পেয়েছিল, নজরুল সম্পাদিত ধূমকেতু শুধুমাত্র সাহিত্য-সংবাদ সাপ্তাহিক নয়, বিপ্লবীদের বেনামী এক শক্তিশালী হাতিয়ারও। আগে থেকেই তাদের কাছে গোপন খবর পৌঁছেছিল যে, ধূমকেতু প্রকাশনা ও পরিচালনার পেছনে স্বামী বিবেকানন্দের ভাই বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের হাতও অনেকখানি। সুতরাং কোন বিপ্লবীদলের লিখিত সদস্য না হলেও নজরুলকে পুলিশ বিপ্লবীদেরই এক অন্যতম অগ্রনায়ক বলে মনে করত।

১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারী। রবিবারের দুপুর। কাজী নজরুল ইসলাম আলিপুর প্রেসিডেনসি জেলে কালি কলম নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। আগেই তিনি জানতেন, পরের দিন সোমবার তাঁকে ব্যাঙ্কশাল

কোর্টে হাজির করানো হবে এবং ইংরেজ বিচারক সুইনহো সাহেবের এজলাসে তাঁর বিচার হবে। তাই তাঁর ঐ ব্যস্ততা। তিনি জবানবন্দী লিখছেন। উপযুক্ত ভাষায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা রাজদ্রোহের অভি-যোগের যথার্থ জবাব দেবেন। বিচারাধীন আসামী নজরুলের মনে তখন ভয় নেই, ভীতি নেই। ক্ষোভ আর বিদ্রোহ। তাই রাজশক্তির তথাকথিত অভিযোগের প্রতিবাদে তিনি আরও সোচ্চার, মুখর!

জবানবন্দী লিখতে বসে আত্মস্থ কবির সে এক অন্যরূপ। তিনি লিখে চললেন :··· আমার লেখায় ফুটে উঠেছে সত্য তেজ আর প্রাণ। কারণ, আমার উদ্দেশ্য ভগবানকে পূজা করা। উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যকারি আঁখিজল। আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি, আজ এই আসামীর পশ্চাতে স্বয়ং সত্যসুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্যসৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজনিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হল, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল সেদিন ভগবান এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পিছনে এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পায়নি। তার আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে-ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে তাঁর বিবেক, তাঁর দৃষ্টি অন্ধ হয়ে গেছল।···

জবানবন্দী লিখতে লিখতে বিদ্রোহী কবির ভাবপ্রবণ মন কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আর মনে পড়ছিল তার মাস তিনেক আগেকার একটি উজ্জ্বল এবং গৌরবময় অধ্যায়ের কথা।

৮ই জানুয়ারী, সোমবার। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের সামনে সকাল থেকেই লোকে লোকারণ্য। সবাই জানত, ঐদিন বিদ্রোহী কবির বিচার হবে। কলকাতা তাই সেদিন ভেঙে পড়েছিল। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত হাজারো মানুষের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে গাড়ি থেকে নামলেন বিদ্রোহী কবি। আগে-পিছে শত শত পুলিশ। হাতে

হাতে বন্দুক-পিস্তল-রাইফেল। হাসলেন কবি। তাঁর হাতে শুধুমাত্র এক প্রস্থ কাগজ আর একটি কলম।

বিচারক সুইনহো সাহেব নিজেও ছিলেন কবি। বিদ্রোহী কবির বিচারের আসনে বিদেশী এক কবি। নজরুল তা জানতেন। কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী। চোখে মুখে কঠিন শপথের স্বপ্ন।

বিচার শুরু হল। চলল দুই পক্ষের আইনজীবীর যুক্তির লড়াই। কবির পক্ষে উকিল মলিন মুখোপাধ্যায়। জোর সওয়াল করলেন। কিন্তু তেমন কোনও লাভ হল না। চীফ প্রেসিডেনসি ম্যাজিসষ্ট্রেট মিঃ সুইনহো ১২৪-এর খ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিদ্রোহী কবিকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বিচারকের রায় শুনে সমাগত দর্শক-শ্রোতাদের চোখে মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। সকলের দৃষ্টি তখন কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কবির দিকে।

দেখলেন: কবির চোখে মুখে তার সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও নেই। বীর কবি হাতের কাগজ খুললেন। তারপর বিচারককে জানালেন, তাঁরও কিছু বক্তব্য আছে।

বিস্মিত বিচারক কবিকে তা বলতে অনুরোধ করলেন। পরিপূর্ণ আদালত তখন স্তব্ধ-শান্ত। বিদ্রোহী তাঁর হাতের কাগজ খুলে নিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে পড়ে চললেন আগের দিন দুপুরে লেখা তাঁর জবানবন্দী :…আমার উপর অভিযোগ আমি রাজদ্রোহী। তাই আমি আজ কারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। একধারে রাজার মুকুট, আর এক ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড। আরজন নত, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে কর্মচারী, আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক আদি অনন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান।…

আমি কোন কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই। লাভ-লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই। কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা আমি যে কবি। আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।…

…আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তূর্য বেজে উঠেছিল। আমার হাতে ধূমকেতুর অগ্নি নিশান দুলে উঠেছিল। সে সর্বনাশা নিশানপুচ্ছ-মন্দিরের দেবতা নটনারায়ণরূপ ধরে ধ্বংস নাচন নেচেছিলেন। এ ধ্বংস-নৃত্য 'নব সৃষ্টির পূর্ব সূচনা।…আমি সত্যরক্ষক, ন্যায়-উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক। যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তা' দিয়ে তাঁর আদর্শ পালন করেছি।…

কারাগারে আমার বন্দিনী মায়ের আঁধারশান্ত কোল এ অকৃতী পুত্রকে ডাক দিয়েছে। পরাধীনা অনাথিনী জননীর বুকে হতভাগ্যের স্থান হবে কিনা জানি না। যদি হয় বিচারককে অশ্রু-সিক্ত ধন্যবাদ দিব।

আবার বলছি আমার ভয় নাই। আমার দুঃখ নাই। আমি অমৃতস্য পুত্রঃ। আমি জানি—

ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়—
(সেই) সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

[প্রেসিডেন্সি জেলে কবির জনপ্রিয়তা বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে আর সেখানে বেশিদিন রাখতে কর্তৃপক্ষ ভরসা পেলেন না। কবিকে এক-দিন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর জেলে পাঠানোর ব্যবস্থা হল।

১৯২৩ সালের অক্টোবরের গোড়ার কথা। এক সকালে রাজবন্দীরা বসে গল্পসল্প করছেন। কাজী নজরুল ইসলাম উঠে দাঁড়ালেন, বললেন শরতের এই সুন্দর সকালে নরক গুলজার করতে আর ভাল লাগছে না। আমি এবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসছি।

সকলে অবাক। রবীন্দ্রনাথ আসবে সে কী কথা! কিছুক্ষণের মধ্যেই সহ-বন্দীরা নজরুলের রসিকতা বুঝতে পারলেন। কাজী গলা

ছেড়ে আবৃত্তি শুরু করলেন : শরৎ তোমার তরুণ আলোর অঞ্জলী ......! আবৃত্তি শেষ হল। আবার গান, আবার আবৃত্তি। বন্দীদশার একঘেঁয়ে জীবনে বৈচিত্র আনতে সকলেই উন্মুখ।

এবার কবির চোখ গিয়ে পড়ে অদূরে জেল-হাসপাতালের লাগোয়া এক ফুল বাগিচায়। দেখেন, একটি গাছে এক রাশ পদ্ম হাসছে। তারই পাশে শিউলী তলায় শিশির ভেজা শিউলী ফুলের মেলা। ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা একদল মধুকর তাই ঘিরে গুণ গুণ স্বর তুলেছে।

কবির তখন বুঝিবা ভাবান্তর ঘটল। তিনি বললেন : চার দেওয়ালের কয়েদখানা প্রকৃতিকে বাঁধা দিতে পারেনি। নীল-আকাশের নীচে কয়েদখানার কড়াকড়ির মধ্যেও শরৎরাণী কেমন সুন্দর সাজে সেজেছেন। বেশ লাগছে! তারপর একটু থামলেন। কবির চোখে আবার বিস্ময়ের ছাপ। বললেন : শরতের এই হিমেল হাওয়ায় ভেসে-আসা শিউলীর সুবাসে কেমন যেন একটা উৎসবের গন্ধ, তাই না?

কবি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন : দুর্গোৎসবে যখন সারাদেশ মাত্‌বে, আমরা কেন তখন এই কয়েদখানায় চুপচাপ বসে থাকব। তারপর কবি নিজেই প্রস্তাব করলেন : দুর্গোৎসবের দু'দিন, অষ্টমী আর বিজয়ায়, আমরাও উৎসব-আনন্দ করব।

কবি একাই একশ'। বললেন : কিছু ভেবো না। আবৃত্তি-গান-নাটক হবে। নাটক আমি নিজেই লিখব। পাত্র পাত্রীর প্রয়োজন নেই। আমি নিজে এবং মৃতের ভূমিকায় কয়েকজন।

কবির কথায় সকলে অবাক, হতবাক। সানন্দে সবাই সম্মতি দেন। এ প্রসঙ্গে কবির কারাজীবনের সঙ্গী বিপ্লবী নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী লিখেছেন :......স্টেজ তৈরি হল। শিল্পী অমরেশবাবু। বাধল না একটুও। সঙ্গে কাজী ও আমরা ক'জন। লতায় পাতায় ফুল আর কাগজের রঙ-বেরঙে অপরূপ হয়ে উঠল বন্দীশালার প্রেক্ষাগৃহ। আনা হল অনেক মোমবাতি। বসানো হল নানা স্থানে..।

জেল সুপার ছিলেন বসন্ত ভৌমিক। রাজবন্দীদের সঙ্গে তার খুব সদ্ভাব ছিল। রাজবন্দীরা তাকে ভালও বাসতেন। তাঁরা বসন্তবাবুর আরেকটা পরিচয় জানতেন। এ প্রসঙ্গে 'নজরুল চরিত্র মানস' গ্রন্থে ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত লিখেছেন :…বসন্ত ভৌমিক তাঁকে (নজরুল) একটি হারমনিয়ম পাঠিয়ে দেন। হারমনিয়ম পেয়ে তিনি খুব খুশী হন এবং গান গেয়েও কবিতা লিখে বেশ আনন্দেই সময় কাটাতে থাকেন।…

১৭ অক্টোবর। বীরাষ্টমীর সন্ধ্যা। অনুষ্ঠান শুরু হল। হারমনিয়ম নিয়ে কবি মঞ্চে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'পাশে দুই বিপ্লবী—অমরেশ কাঞ্জীলাল এবং নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। তিনি রাজবন্দী বন্দেমাতরম্ গানের সুর তুললেন। তারপর কবি 'বিদ্রোহী' 'কামালপাশা' এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি কবিতা আবৃত্তি করলেন। সবার শেষে গান। মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় দেবী দশভূজার উদ্দেশ্যে উদাত্তকণ্ঠে কবি গান ধরলেন :

অনেক পাঁঠা মোষ খেয়েছিস্
রাক্ষসী তোর যায়নি ক্ষুধা।
আয় পাষাণী এবার নিবি
আপন ছেলের রক্ত-সুধা।
দুর্বলেরে বলি দিয়ে
ভীরুর এ-হীন শক্তি পূজা—
দূর করে দে, বল মা, ছেলের
রক্ত মাগে দশভূজা।…

বীরাষ্টমীর অনুষ্ঠান শেষ হল। পরের দিন বিরতি কিন্তু বিজয়া উৎসবের প্রস্তুতি চলল।

১৯শে অক্টোবর। সন্ধ্যার আগেই আসর সরগরম। সহ-বন্দীরা উপস্থিত। উপস্থিত কারা-কর্মীরাও। সকলেই জানতেন, কাজী নজরুল স্বয়ং একক অভিনয় করবেন।

হঠাৎ মার মার শব্দ। পায়ের বুট আর হাতের লাঠির শব্দে চারদিক ত্রস্ত! দূরে অস্ফুট কান্নার সুর। চাপা কোলাহল। ধীরে ধীরে পর্দা উঠল। দেখা গেল, মঞ্চে পড়ে আছে কয়েকটি মৃতের লাশ। একটি অবোধ শিশুর বুকে বিদ্ধ ছোরা রক্তে ভেজা সারা দেহ। দস্যু সর্দ্দার নিস্তব্ধ নিশচুপ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে। শিশুর মুখের দিকে তার নিষ্পলক দৃষ্টি। ক্রমে সে হাঁটু ভেঙে আস্তে শিশুর পাশে বসল। তারপর অতি সন্তর্পণে তুলে নিল শিশুর দেহ। দস্যুর স্পর্শে আহত শিশু কোঁকিয়ে উঠল। অসহায় শিশুর চীৎকারে দর্শকদের চোখেও বুঝি জল এল। পর্দা পড়ল।

মুহূর্তেই আবার পর্দা উঠল। দস্যুর হাতে ছোরার বদলে বীণা। মুখে হাসি-আনন্দ-গান। দস্যু হাসে, কাঁদে, নাচে! এক জীবন থেকে অন্য জীবনে উত্তরণ। সে এক অপূর্ব অনুভূতির প্রকাশ। মৃত্যু-কান্নার শেষে নতুন জীবনের গান। পালা বদলের পালা শুরু। দর্শকদের সমবেত করতালি। পর্দার আড়ালে থেকেও ভেসে আসে সমবেত সুরের গান। জীবন জয়ের সুর। ধীরে ধীরে পর্দ্দা নেমে আসে। বিজয়া উৎসব শেষ।

গুণমুগ্ধ দর্শকরা ছুটে যায় অভিনেতা নজরুলের কাছে। অপূর্ব একক অভিনয়। একে একে সকলে কবিকে আলিঙ্গন করেন। তারপর সেই আলিঙ্গনের রেশ মঞ্চ ছেড়ে সারা কয়েদখানায় ছড়িয়ে পড়ে। এবং অবশেষে চলে সর্বজনীন মিষ্টি মুখ।

দেশে তখন মুক্তির আন্দোলন চলছে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সবে অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়েছে। নীতি নির্দ্ধারণের প্রশ্নে জাতীয় কংগ্রেস নানা মত নানাভাবে প্রকাশিত। এক পক্ষের ইচ্ছা, আইন সভার ভেতরে গিয়ে বিদেশী সরকারের স্বদেশ-বিরোধী কাজকর্মের বিরোধিতা করবেন। অপর পক্ষ তাতে নারাজ। তাদের মত, বিদেশী শাসকদের আইন সভা অগ্রাহ্য করতে হবে। আন্দোলন চলবে আইন সভার বাইরে। এই মূল নীতির দ্বন্দ্বে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দলের সৃষ্টি হল। নেতৃত্বে রইলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মতিলাল

নেহরু প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে আইন সভায় ঢুকতে হবে। তারপর ভেতরে এবং বাইরে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে চলবে যুগপৎ লড়াই।

১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস। কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হল। স্বরাজ্য দলের নেতারা স্থির করলেন, আসন্ন নির্বাচনে তাঁরাও প্রার্থী দেবেন।

ঐ বছরই গোড়ার দিকে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন হয়। তখন তরুণ কবি নজরুল ইসলাম কর্মী হিসাবে দারুণ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। দেশপ্রাণ বীরেন, শাসমল, সরোজিনী নাইডু, শরৎ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের তিনি মন জয় করে নেন। তা ছাড়া তারও বছর তিনেক আগে স্বদেশ প্রেমের কবিতা লিখে তিনি এক-বছর কারাবাসও করেন। সারাদেশে বিদ্রোহী কবি তখন খ্যাতির শিখরে। কংগ্রেসের সদস্য হয়েও নজরুল তখন স্বরাজ্য দলের সঙ্গেই বেশি ঘনিষ্ঠ। তাই দলীয় নেতারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিলেন তরুণ কবিকে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রার্থী করবেন।

নেতৃবৃন্দের আহ্বানে নজরুলও সানন্দে সাড়া দিলেন। তিনি স্বরাজ্যদলের মনোনীত প্রার্থীরূপে ঢাকা কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীয় আইন-সভার নির্বাচনে দাঁড়ালেন। ঢাকা নির্বাচনকেন্দ্রের অধীনে তখন ময়মনসিং, বাখরগঞ্জ (বরিশাল), ফরিদপুর ও ঢাকা জেলাও ছিল। বিস্তীর্ণ ঐ এলাকার জন্য প্রার্থীপদ ছিল মাত্র দুইটি। বলাবাহুল্য ঐ দুইটি আসনই মুসলমান প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

ঐ ঢাকা-কেন্দ্রে অর্থাৎ চারটি জেলায় সর্বমোট ভোটারের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজার একশ' ষোল। তখনকার দিনে সকল প্রাপ্ত বয়স্কদেরই নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। জমি-জমা অথবা সম্পত্তির ভিত্তিতেই ভোটার তালিকা তৈরী হত।

স্বরাজ্যদলের হয়ে কবি নজরুলতো নির্বাচন প্রার্থী হলেন। কিন্তু তাঁর সামনে একের পর এক সমস্যা ভীড় করতে লাগল। প্রথমত, আর্থিক দিক থেকে তিনি কোনও দিনই স্বচ্ছল ছিলেন না।

বন্ধুবান্ধবরা কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করলেন। তাতেও সমস্যার সমধান হল না। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই আর্থিক চিন্তায় তিনি কিছুটা বিচলিত হলেন।

তারিখটা অকটোবরের ২৮। নির্বাচন প্রার্থী তরুণ কবি ছুটে এলেন কলকাতা। বিশিষ্ট নেতাদের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার তেমন কোনও সুরাহা হল না। অতঃপর ঐদিন সন্ধ্যায় কবি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শরণাপন্ন হলেন। এ প্রসঙ্গে কবিবন্ধু মুজফফর আহম্মদ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন :··· পুরো বিকেল বেলাটা সে কাটাল ডাঃ বিধনাচন্দ্র রায়েব বাড়িতে, সন্ধ্যার সময় তিনি তাকে তিনশ' কয়েক টাকা দিলেন। সম্ভবত তাঁর সে অপরাহ্নে পাওয়া পুরো ফিসের টাকাটা।

বন্ধু-বান্ধব এবং নেতাদের সহযোগিতায় অর্থ সমস্যা কিছুটা ঘুচল সত্য কিন্তু কবির সামনে আরেক সঙ্কট দেখা দিল। নির্বাচনী প্রচারে নেমে কবিকে তীব্র সমালোচনার মুখোমুখি হতে হল। গোঁড়া মৌলভিরা তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রচার-যুদ্ধে নামলেন। মৌলভিদের অন্যতম ফরিদপুরের জনৈক তমিজুদ্দিন সাহেব কবিকে মুখের উপর কাফের বলে অভিযোগ করলেন। তার অভিযোগ মুসলমান হয়েও কবির হিন্দুদের সঙ্গেই বেশি মাখামাখি। হিন্দুদের দেব-দেবী নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন। কবির ঘরে সিথেয সিঁদুর পরা স্ত্রী ইত্যাদি বহু অভিযোগ আর কড়া ভাষায় অনুযোগ।

কবি হাসলেন। মৌলভি তমিজুদ্দিন সাহেবকে বললেন :আপনি আমাকে কাফের বলেছেন মাত্র। এর চেয়েও অনেক বেশি কড়া কথা আমাকে শুনতে হয়। আমার গায়ের চামড়া এতই পুরু যে, আপনাদের তীক্ষ্ণ কথার বান আর তা' ভেদ করতে পারে না। তবে আপনি যদি আমার লেখা দু' একটা কবিতা পড়েন তো দারুণ আনন্দ পাব। কবি তাঁর কথা শেষ করে আর উত্তরের প্রতীক্ষা করলেন না। গম্ভীর কণ্ঠে আবৃত্তি শুরু করলেন :

এক আল্লার সৃষ্টি সবাই
এক সেই বিচারক,
তাঁর লীলার বিচার করিবে
কোন্ ধার্মিক বক্ ?
বকিতে দেব বকাসুরে আর,
ঠাসিয়া ধরিব টুটি—
এই ভেদ জ্ঞানে হারিয়েছি মো'রা
ক্ষুধার অন্ন-রুটি।...

আবৃত্তি শুনতে শুনতে মৌলভির দু'চোখ বিস্ময়ে ভরে উঠল। কবি বুঝলেন তাঁর কবিতা মৌলভির মন গলিয়েছে। তিনি এবার আবার আবৃত্তি ধরলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'মহরম'।

মৌলভি এবং তার অনুগামীরা নজরুলের প্রশংসায় মুখর হলেন। তাঁরা বললেন : এতদিন নজরুল সম্পর্কে যেসব কথা শুনে এসেছেন তা' ঠিক নয়—মিথ্যা প্রচার মাত্র। মোটেই তিনি কাফের নন। বরং একজন খাঁটি মুসলমান।

কবি এবার একটু থামলেন। তারপর জড়ো হওয়া মানুষের কাছে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন : আমার কাব্য, আমার গান আমার অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দ গেয়ে চলেছি। এ সব তারই প্রকাশ।...

বক্তৃতা শেষে আবার আবৃত্তি :
যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই
করব সেথায় বিদ্রোহ—
ধামা ধরা, জামা ধরা,
মরণ-ভীতু চুপ রহো।...

অবশেষে একদিন নির্বাচন শেষ হল। কিন্তু তরুণ কবি নজরুল ইসলাম জয়ী হতে পারলেন না। তবুও তাঁর মনে ক্ষোভ নেই। শুধু খেদ প্রকাশ করে বললেন : ধর্মের দোহাই দিয়ে যেখানে নির্বাচন হয়, সেখানে জন নেতার মূল্য কতটুকু ! ফিরে এলেন তিনি কৃষ্ণ-

নগরে। ক্রমে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের পরিবর্তন এল। নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে তিনি বুঝেছিলেন, পরাধীন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা কতটা অবৈজ্ঞানিক। টাকা থাকলে নির্বাচনে জয়লাভ সহজসাধ্য। তা' ছাড়া শিক্ষিত এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই। জমির মালিক আর জমিদার শ্রেণীই মূলতঃ ভোটদাতা এবং ভোট প্রার্থী। তরুণ কবির বিদ্রোহী মনে তাই নির্বাচন সম্পর্কে একটা অনীহার ভাব জেগে উঠল। তিনি ক্ষোভ আর খেদ প্রকাশ করে নির্বাচন প্রসঙ্গে লিখলেন :

হায় গণ নেতা ভোটের ভিখারী,
নিজের স্বার্থের তরে—
জাতির যাহার ভাবী আশা, তারে
নিতেছ খরিদ করে। ··

বলা বাহুল্য, পরবর্তীকালে আর কখনও তিনি কোনও নির্বাচনে দাঁড়ান নি। কেউ তাঁকে নির্বাচন প্রার্থী করতে চাইলে এই কবিতা আবৃত্তি করেই তাকে যথার্থ উত্তর দিতেন। এবং রসিকতা করে বলতেন : নির্বাচন প্রেমিকদের জন্যই আমার এই নির্বাচনী কবিতা।

আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।—বিদ্রোহী কবি নজরুলকে সম্বর্ধনা জানাতে উঠে বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র প্রতিশ্রুতিময় ঐ অঙ্গীকার করেছিলেন ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

সেদিন ছিল রবিবার। দুপুরের পর থেকেই লোকে লোকারণ্য। মধ্য কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস) নজরুল সম্বর্ধনার যে আয়োজন হয়েছিল, সে খবর সকলেরই জানা ছিল। তাই সভা শুরুর অনেক আগেই 'হল' ভরে বাইরে এসে উপচে পড়েছিল জনস্রোত। সে দিনের সেই শীতের বিকালে সহর কলকাতা যেন ঘর ছেড়ে বাইরে নেমে এসেছিল। ঐতিহাসিক সভার সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যথাসময়ে সম্বর্ধনা সভায় এসে উপস্থিত হলেন।

পর পর এস, ওয়াজেদ আলী, দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু, জলধর সেন, অপূর্বকুমার চন্দ, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রবীন ও নবীন সাহিত্যিক-সুধীবৃন্দ এসে গেলেন।

মঞ্চে বসলেন সকলে। মাঝখানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর দু'পাশে দুই তরুণ। একজন বিদ্রোহী কবি, অপরজন বিপ্লবী নেতা। সভাস্থল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখর হল। সেই সমবেত ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হল বাইরেও। স্বতস্ফূর্ত করতলধ্বনির মধ্যে আচার্যদেব উঠে দাঁড়ালেন। তারপর স্মিতহাসি হেসে সভাপতির ভাষণে আচার্য-দেব বললেন : আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জাদুকরী প্রতিভায় বাংলাদেশ সম্মোহিত হয়ে আছে। তাই অন্যের প্রতিভায় তেমন করে ধরা পড়ছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে আনন্দ অনুভব করছি যে নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু। কিন্তু নজরুল তা' নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা' বাঙালীর প্রাণে এক নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

আচার্যদেবের ভাষণ শেষ হলে আবার বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উঠল। চারদিক আবার আনন্দমুখর। এরপর মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির এস ওয়াজেদ আলি তাঁর হাতে বাঁধানো একটি 'মানপত্র'। ওয়াজেদ আলি বাঙালী জাতির পক্ষ

থেকে ঐ মানপত্র পাঠ করে বললেন: কবি, তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙলীকে চিরঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা-সিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের উর্ধে। সে আপন পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাগলা ঝোরার জলধারার মত। সে স্রোতধারায় বাঙালী যুগসম্ভাবনার বিচিত্র লীলাবিশ্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়-মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও।

বাঙলার সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলকহারা নীল-নয়নে নিবিড় স্নেহ-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক বন্দনা গ্রহণ কর।

তুমি বাঙালীর ক্ষীণকণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্চ্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ-দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয় ইঙ্গিত নতমস্তকে বরণ করিতেছে। তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ-অভিবাদনে তুমি নয়নপাত কর।

তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যামা-কোয়েলার কণ্ঠেইরাণের গুলবাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার সাথে আঙুর-লতিকার বাহুবন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যাম শান্ত কণ্ঠে ইরাণী সাকীর লাল সিরাজীর আবেশ-বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত-নিবেদন গ্রহণ কর।

ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়নসায়রে তাহার ছায়াপাত হইয়াছে। মানুষের ব্যথাবিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি। চিরঞ্জীব মনীষী তুমি। তোমাকে আজ আমাদের সবাকার নমস্কার!

কবির উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করা শেষ হল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

সহ সমবেত সকলে করতালির মধ্য দিয়ে কবির উদ্দেশে আবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। তারপর সোনার দোয়াত-কলম এবং একটি রূপার আধারে ভরে মানপত্রটি কবির হাতে তুলে দেওয়া হল। ওদিকে পাশে হারমনিয়ম নিয়ে নলিনীরঞ্জন সরকার আর উমাপদ ভট্টাচার্য তখন কবির উদ্দেশ্যে সঙ্গীত-সুধা নিবেদন করে চলেছেন।

উন্নতশির কবি এবার উঠে দাঁড়ালেন। শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতার ভারে তিনি তখন অবনত। টানাটানা চোখ, ঢেউ খেলানো বাবরি চুলেভরা ঝাঁকড়া মাথায় গান্ধীটুপি, সুদীর্ঘদেহী কবি জোড় হাতে সকলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নমস্কার আর প্রীতি জানালেন। তারপর সবিনয়ে বললেন : আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু-মন-প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক বনফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়তো মাথায় আমার চুলের অভাব নেই। কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয়-ঘট যে ভরে উঠলো। নদীর জল মঙ্গল-অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তারা ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদী-কূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা ছাড়া, আপনাদের ভালবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজকের দিনে যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভদৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয়, অন্ততঃ আজকের দিনে তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়তো সত্যি সত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের—যাঁরা এ সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি,

যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না। এবং হয়তো একটু বেশিকরেই স্মরণ করছেন। ফুল ফোটানোর চেয়ে হুল ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ।

ওদিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যি একটু বেশি রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যি-সত্যি আনন্দ উপভোগ করি। পান্‌সে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভাল। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ বাগসই করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি নিশ্চয় আমার পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমি অন্তরের শ্রদ্ধা-নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অবন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধূলাবালি কাদামাটি চড়িয়েছেন। এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে, মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেইদিনই করেছেন যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভাল লেগেছে সেই 'ভাল লেগেছে'-টাকে ভাল করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটিমাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতিনমস্কার নিবেদন করা। আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দি'ন। আমাকে বড়-বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সবার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তা হলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।...

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা আমায় চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা জানেন যে, সত্য সত্যই আমি ভাল মানুষ। কোনো অনাসৃষ্টি

করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে ঘা দিয়েছি, সেখানে ঘা খাওয়া প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। পড়-পড় বাড়িটাকে কর্পোরেশনের যে কর্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার যে ঐ পড়-পড বাড়িটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা ক'রে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ-কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

একথা স্বীকার করতে আজ লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীট্‌সের মত আমারও মন্ত্র : **Beauty is Truth, Truth Beauty.**

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে, জানিনে। কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি, আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরিশিখরের পলাতকা সাগর সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরিশিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরুপথে পথ না হারাই! এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান-সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি—এই হোক্ আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে-পাকে বাঁকে-বাঁকে কুটিল-ফণা-ভুজঙ্গ, প্রখর-দর্শন শার্দূল পশুরাজের ভ্রূকুটি। এবং তাদের নখ-দংশনের ক্ষত আজও আমার অঙ্গে-অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশান কোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার-ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন বাজবে, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে

আসবে তার পূর্ব পরিচয় নিয়ে। নব-বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না বলে—তাঁদেরকে আমরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তার স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি। বনের পাখি নীড়ের ঊর্ধে উঠে গান করে বলে বন তাকে কোনোদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ -ভেবে কাক তাড়া করে বলে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউ হয়তো সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেটুকুই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করুন। আম গাছকে চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনে কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টে এ ঠ্যাঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও লোপ পেয়ে যাবে।...

যৌবনের রক্তশিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠনমোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই বলে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না আমিও আছি তাঁদের দলে। তবে হাতের মশাল হয়ে নয়, কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুলমেলার নওরোজে আমায় খরিদ্দাররূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে, সেদিন আমিও আসব, ঐ মেলার শাহাজাদা খররমের মতই আমার চোখে তাজের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ের পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-জীর্ণ মূর্তিতে দেখেছি, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি।

যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখা স্তব-স্তুতি।

কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দু'টোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি। গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে-হাতে মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়ে অশোভন হয়ে থাকে তা হলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁটছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি, আরেকজনের আস্তিনে আছে ছুরি।...

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলাবালি, এত ধোঁয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপ-বর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরব।

কিন্তু এ যদি বেদনা-সাগর মন্থনের হলাহলই হয়, তা' হলে ঐ সমুদ্র-মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এর দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়াতো এ সমুদ্র-মন্থন ব্যাপার সহজ হতো না। তবু তাঁদের বলি, আজকে হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—ব'সে থান, অমৃত আছে, সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের আমার সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা-প্রীতি-নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের আমার অজস্র ধন্যবাদ।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বক্তৃতা শেষ হলে আবার জয়ধ্বনি, আবার বিপ্লবী সঙ্গীত গীত হল। জন-সাগরে প্রাণের বান ডাকল। করজোড়ে কবি গিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের মাঝখানে বসলেন। সভাপতির অনুরোধে খদ্দরের সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি আর মাথায় গান্ধীটুপি পরা কবিবন্ধু বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র

এবারে উঠলেন প্রধান অতিথি রূপে ভাষণ দিতে। আবার জন-সাগরে প্রাণ-বন্যা দেখা দিল। ধ্বনি উঠল : দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র জিন্দাবাদ ! সুভাষ-নজরুল জিন্দাবাদ বন্দেমাতরম্…

সুভাষচন্দ্র মঞ্চে সামনের দিকে এগিয়ে এসে স্বভাব-সুলভ হাসি হেসে সকলকে শান্ত হতে অনুরোধ করলেন। তারপর বলিষ্ঠ কণ্ঠে তিনি বিদ্রোহী কবি নজরুল এবং সাহিত্য আলোচনা শুরু করলেন। গণচেতনার কাজে, দেশাত্মবোধ জাগাতে, কবির কবিতা ঝিমিয়ে পড়া একটা জাতির জীবনে যে বিপ্লবের জাদুমন্ত্র এনে দিল, তিনি তার সরল সহজ এবং সাবলীল ব্যাখ্যা করলেন। তারপর প্রতিশ্রুতিময় ভাষণে বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বললেন : স্বাধীনদেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে কোন উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুল তার ব্যাতিক্রম দেখা যায় ! নজরুল জীবনে নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়োছলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীনদেশে খুব বেশি। এতেই বোঝা যায় যে, নজরুল জীবন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকেই যাই। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব খুব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বোঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা জাগত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্যি কথা। তাঁর

অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখন তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয়-সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু"র মত প্রাণ-মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না। নজরুল যে স্বপ্ন দেখছেন সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন!

বিদ্রোহী কবির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিপ্লবী নেতা সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন, নজরুল তখন আনন্দে অভিভূত। কৃতজ্ঞচিত্তে নজরুল সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকালেন, সুভাষচন্দ্রও তাঁর চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপচাপ। কী যেন বলতে চান! বিপ্লবী নেতার নীরব চাহনির না—বলা বাণীর কথা হয়তো বিদ্রোহী কবি বুঝতে পারেন। সুভাষচন্দ্রের মনোবাসনা পূরণ করতে তাই সানন্দে এগিয়ে যান নজরুল! পাশে রাখা হারমনিয়মটা টেনে নিয়ে একবার উপস্থিত সাগরের অশান্ত ঢেউগুলি দেখে নেন। তারপর তাঁর ধরাজ গলায় সুর ওঠে: দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে···

জনতরঙ্গ শান্ত সমাহিত। শ্রোতাদের চোখে মুখে মহামুক্তি আর মহামিলনের আকুতির শপথ। কবির গান আর সুর-ঝংকারে শ্রোতারাও গুণগুনিয়ে সুর তোলে। সুর তোলেন পাশে-বসা অন্যান্য সুধীসাহিত্যিক আর নেতারাও।

নজরুল থামলেন। সভায় আবার হাততালি আর জয়ধ্বনি! আবার অনুরোধ—আরও গান আরও সুর চাই।

বিদ্রোহী কবি আনন্দে সে অনুরোধ মাথা পেতে নেন। তারপর আরেকবার ফিরে তাকান সুভাষচন্দ্রের দিকে। সুভাষচন্দ্র হাসেন। সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও কবির দিকে চোখ রেখে হাসি মুখে মাথা নেড়ে তাঁর সম্মতি জানান।

কবি আবার সুর তোলেন: "বীরদল চলো সমরে! যেন

সমর-সঙ্গীত। কবির উদাত্ত কণ্ঠের সমর-সঙ্গীত সমস্ত জনসভাকে উদ্বেলিত করে তুলল। তালে-তালে হাততালি দিলো সমগ্র সভা। মঞ্চে-বসা দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র তখন নিমগ্ন, আত্মস্থ প্রায়।

"আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে"—এই বাসনা যে তাঁর জীবনেই বাস্তবায়িত হবে, একথা কি সেদিন বুঝেছিলেন সেদিনের দেশগৌরব—পরবর্তী জীবনের নেতাজী?

দু' চোখ বুজে বসে শান্ত সমাহিত বিপ্লবী বীর হয়তো তাঁর পরবর্তী জীবনের সমর-সঙ্গীতের কথাই ভাবছিলেন। কে জানে সেই ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা সভায় বসেই বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র নেতাজী সুভাষের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিনা! হয়তো তাই। কেননা, ঐ ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা সভার পর মাত্র এক দশকের মধ্যে সুভাষচন্দ্র স্বদেশের মুক্তির জন্য যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গড়ে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সেখানে নজরুল সঙ্গীত তাঁর সেনাদের সমর-সঙ্গীত হয়েছিল। বিদ্রোহী কবি নজরুলের ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা সভায় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের প্রতিশ্রুতিময় ভাষণের সঙ্গে পরবর্তীকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী কর্ম-ধারার মিল অনেকখানি।